মুকুল

মাঘ
১৩৪৮ সাল

শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত
২৯৪ দুর্গাবোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা
বার্ষিক ২৲ টাকা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

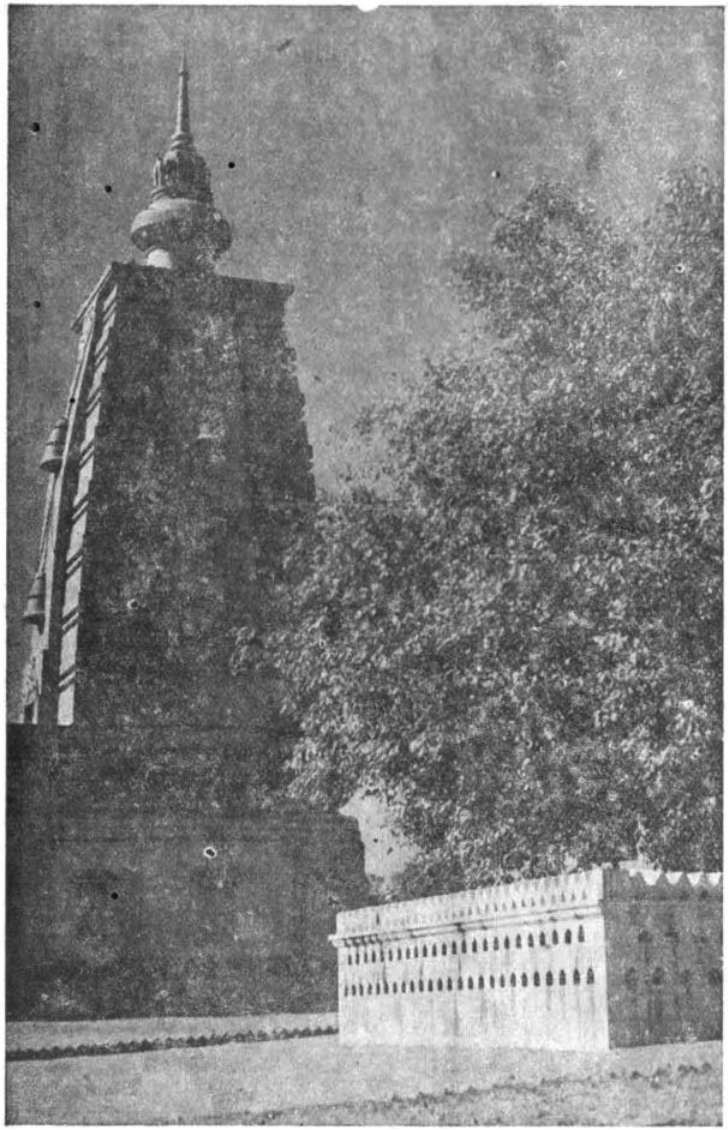

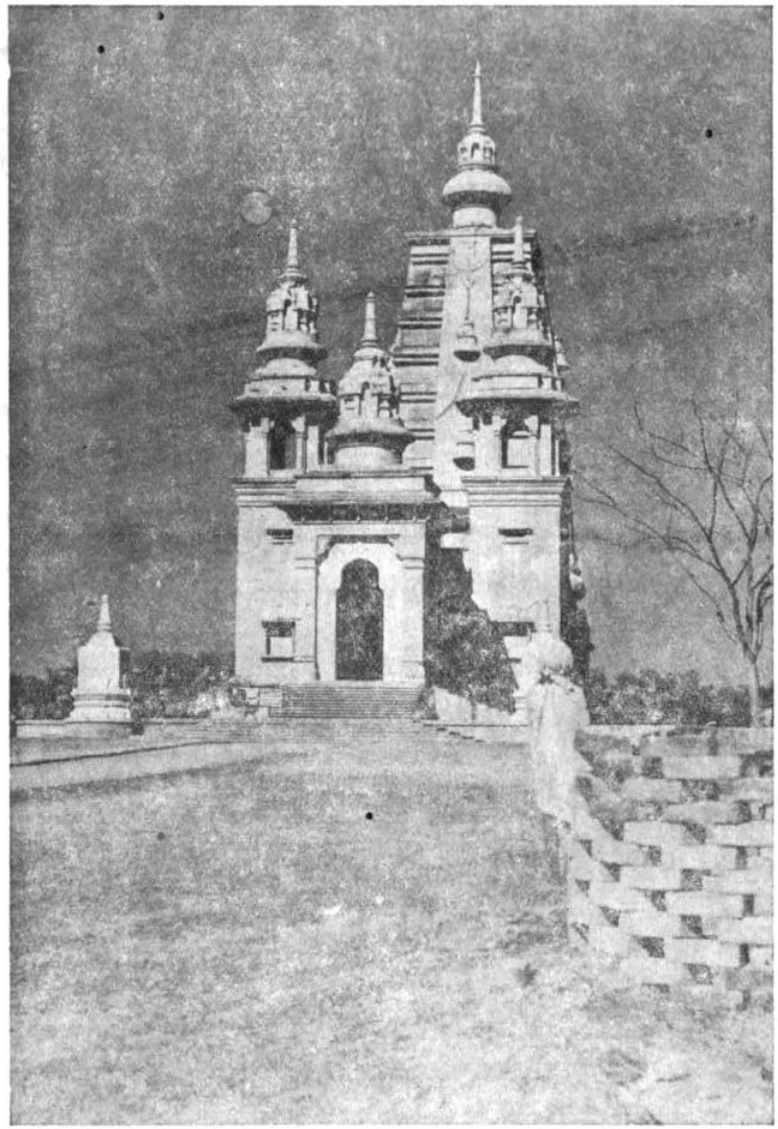

১৩০২ সনে প্রবর্ত্তিত

"ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাস',
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা"

[১৬শ বর্ষ] নব পর্য্যায়] মাঘ, ১৩৪৮ [৯০ম সংখ্যা

গৃহ-হারা

শ্রীসুখলতা রাও।

এক সে নগর শোভাময়, জগৎ জুড়ে আছে নাম যার,
কত না প্রাসাদ ইমারত, প্রসিদ্ধ দেউল কবেকার;
সেথায় সুন্দর পথঘাট, বাগান, বড় বড় কারখানা,
মাটির নীচেও চলে গাড়ী, আকাশে ওড়ে যান মেলে ডানা।
মানুষ বিজলী নিয়ে খেলে, বেতারে কথা শোনে, কথা কয়,
বেতারে দূরের ছবি দেখে, আমোদ খেলাধূলা সমুদয়।
সেখানে শিশুরা ছিল সুখে, উন্নত জীবনে, সমাদরে,
তাদের সুশিক্ষা হবে বলে অশেষ আয়োজন ঘরে ঘরে।

মায়ের স্নেহের কোলে ছিল, পিতার আশ্রয়ে নিরাপদে ;
জাতির গৌরবে ভরা বুক, করে না মাথা নীচু কারো পদে।
মৃত্যু ঘেরিল একদিন, পাতাল ফুঁড়ে যেন এল বান,
শিশুর আবাস গেল ভেঙ্গে, সকলি হয়ে গেল খান্ খান্।
এমন মরণ অস্ত্র সৃজন কেন করে মানুষেরা ?
নিজের স্বার্থ আঁকড়িয়ে কেন এ হানাহানি করে এরা ?
কাহারো আরাম নেই দিনে, বিরাম নেই রাতে, জেগে থাকে,
আঁধারে দৈত্য যেন সব ঝড়ের মত আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
প্রলয় আগুন দেয় জেলে, মেঘের দেশ হতে হানে বাজ,
উঃ কি ভীষণ রব, যায় পৃথিবী রসাতলে বুঝি আজ।
কার যে কি ক্ষতি কোথা হ'ল, গণনা কেবা বল করে তার,
শুধুই ধ্বংসের লীলা এযে, শুধুই চারিদিকে হাহাকার।
বাঁচাতে হবে ত শিশুদের, জাতির আশা বল ইহারাই,
অমূল্য জীবন ইহাদের, যেমন ক'রে হোক বাঁচা চাই।
মানুষ মানুষে ভালবাসে, শত্রুতা সকলেই নাহি করে ;
অচেনা বন্ধুরা ডেকে নিল, অজানা দেশ হ'তে, প্রেমভরে।
প্রবাসে গচ্ছিত ধন হয়ে যতনে র'বে এই শিশুগুলি,
এতেই কল্যাণ জেনে মনে, পরের ঘরে র'বে দুখ ভুলি।
বালক বালিকা শত শত, সাহসে বুক বেঁধে তাই হেসে,
স্বদেশ স্বজন পিছে ফেলে, সাগর পরপারে গেছে ভেসে।
আবার আসিবে ফিরে তারা, অন্তরে নিয়ে গেছে এ ভরসা,
তখন, যা কিছু ভাঙ্গা চোরা, নূতন হবে সবি, এই আশা।

মহৎ প্রাণ

বিলাতের এক সহরের রাস্তায় একটি সাত বছরের ছেলে তার মনিবের সঙ্গে হেঁটে চলেছে। একটুকু ছেলের আবার মনিব কি করে হয় ? সে কি তবে কাজ করে ? হাঁ ! তার মুখ ও চুল কালো—তবে কি সে নিগ্রো। না, সে ইংরাজ সে চিমনীর কালী ঝুল পরিষ্কার করে। তার চোখের জল যেখান দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে—সে যায়গায় কালী ধুয়ে গিয়ে তার ফর্সা রং দেখা যাচ্ছে। তার মা বাবা নাই। সে বেচারী তার মনিবের সঙ্গে অত জোরে জোরে চলতে পারছেনা।

তারা একটা বড় বাড়ীর সামনে এসে

দাঁড়ালো। মনিব দরজায় টোকা মারাতে এক চাকরাণী এসে দরজা খুলে দিল। তখন সবে সকাল হয়েছে—বাড়ীর লোকেরা তখনও বিছানা ছেড়ে উঠেন নাই। চাকরাণীর চোখের দিকে চেয়ে বোঝা গেল সেও এখনি ঘুম থেকে উঠেছে। সে তাদের খাবার ঘরে নিয়ে গেল। ছোট্ট ছেলেটিকে সেই অন্ধকার ঝুলে ভরা চিমনির ভিতর ঢুকে সব পরিষ্কার করতে হবে। তার মনিব তাকে ভোর সাড়ে চারিটার সময় ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। তাকে এক টুকরা রুটি খেতে দিয়েছিল—সেটুকু খেতে খেতেই সে ঘুমে ঢুলে পড়ছিলো। শেষে সে টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েই পড়লো। এত ছোট ছেলে কি অত ভোরে উঠিতে পারে না কাজে যেতে পারে? কিন্তু হায়! মনিব কাণটি মলে দিয়ে ব্রাসের বাঁট দিয়ে তাকে মারলেন আর বেচারীর সুখ নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তাকে যে পাঁচটায় ধনীর বাড়ীর চিমনি পরিষ্কার করতে হবে।

চিমনি সাফ করতে হলে ছোট্ট ছেলেরাই সেই কাজ করত আর তাদের মনিবরা সঙ্গে থাকত কারণ চিমনি থেকে বার হবার সময় তাদের টেনে বার করতে হোতো।

সেই ছোট্ট ছেলেটি যখন চিমনীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন তার হাত ও হাঁটু ইঁটে লেগে ছড়ে যাচ্ছিল আর চোখে ঝুল পড়ছিলো। তারপরে চিমনী দিয়ে উঠতে উঠতে তার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল! তারপরে একটু ঠাণ্ডা পরিষ্কার বাতাস উপর দিয়ে আসাতে সে চোখ খুললো ও উপরে চেয়ে দেখে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সে প্রায় ছাদে এসে পড়েছে। অবশেষে তার মাথাটা চিমনীর গর্ত্ত দিয়ে উপরে বার হলো। তার মনিব তাকে টেনে তুলবার জন্য ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিল।

সারাদিন সেই ছোট্ট ছেলেটি কাজ করলো। রাত্রে তার মনিবের বাড়ীতে গেল। তাকে খেতে দিল কিন্তু সারাদিনের কালীঝুলি ধুয়ে দেহ পরিষ্কার করিবার জন্য একটুও জল পেলনা। সেই নোংরা অবস্থায় শ্রান্তক্লান্ত হয়ে খড়ের গদির উপর শুয়ে পড়লো। একটা খসখসে কম্বল গায়ে দিয়ে বেচারী হাত পায়ের ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমালো।

ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র এই রকম ছোট ছোট ছেলেরা চিমনী পরিষ্কার করে বেড়াতো। কারও কারও বয়স ৬ বছরের বেশী নয়। কোন সময়ে বা বাড়ীর কর্ত্রী সুন্দর দামী রেশমের পোষাক পরে ঝলমল করতে করতে এসে ছোট্ট ৬ বছরের চিমনী পরিষ্কার করার ছেলেটিকে দয়া করে জিজ্ঞাসা করতেন "আমার চিমনীটা তুমি সাফ করে দেবে কি? আশা করি এ কাজটা করতে তোমার কোন কষ্ট হয় না।"

ছেলেটির মনিব তার কাছেই দাঁড়িয়ে। যদি ছেলেটি বলে যে সে একাজ করতে ভয় পায় তার হাঁটু ছড়ে যায়, তার চোখ জ্বালা করে, তাহলে তার মনিব যে তাকে বেত দিয়ে মারবে। সেজন্য সে বলে—নিশ্চয়, আপনার চিমনী আমি সাফ করে দেবো—কষ্ট হবে না।

তখন ধনী মহিলা তার উত্তর শুনে খুব খুসী হয়ে অন্য কাজে চলে যান। তিনি ভাবেন এত অল্প বয়সে টাকা উপার্জ্জন করা, কাজের হওয়া, বেশ ভালই। কিন্তু এতে যে কচি কোমল প্রাণ বালকদের কি কষ্ট হয় তা ধারণায় আসে না।

কিন্তু তাদের দুঃখে একজনের প্রাণ কেঁদেছিল।

তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য লর্ড সাফটসবেরী। তিনি অনেক চেষ্টা করে এক আইন পাস করেন যে ১৬ বছরের কম বয়সেয় ছেলেদের দ্বারা চিমনী পরিষ্কার করানো হবে না। কচি ছেলেদের যে কি কষ্ট হয় তা বর্ণনা করে সব সভ্যদের তাদের অবস্থা বুঝিয়ে দিলেন। এই আইনটি পাস করতে ৩০ বছর লেগেছিল।

সংবাদপত্রে গরীব ছেলেদের স্কুলের সাহায্যের জন্য আবেদন পত্র পড়ে তাঁর মন বিচলিত হলো। তিনি সেই "র‍্যাগেড স্কুল" দেখতে গেলেন।

লণ্ডনের যে অংশে গরীবরা বাস করে সেই অংশে গলির মধ্যে স্কুল! রাস্তা কি অপরিষ্কার আর গ্যাসের আলোও সংখ্যায় খুব কম। স্কুল ঘরটি কি অপরিষ্কার। ঘরে কেরোসিন তেলের গন্ধে ভরা। বেঞ্চের উপর ছেঁড়া কাপড় পরা ছেলে মেয়েরা বসে স্লেটে অঙ্ক কসছে কিন্তু বাস্তবিক অঙ্ক না কসে তারা হাসি গল্পই বেশীর ভাগ করছিল। রাস্তার লোকেরা শুধু শুধু দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল আর জানালায় পাথর ছুঁড়ছিলো।

লর্ড সাফটসবেরী ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন তাদের মুখ কি শুষ্ক ও বিবর্ণ যেন বুড়া ও বুড়ীর মত। তাদের শিক্ষককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এরা সব কোথায় থাকে।

শিক্ষক মহাশয় উত্তর দিলেন—প্রায় অধিকাংশ ছেলেদেরই বাড়ী নাই। ঐ ছেলেটি পোলের তলায় শোয়, ঐ ছেলেটি একটা গাড়ীর মধ্যে শুয়ে থাকে। এই ভীষণ শীতে ঐ বুদ্ধিমান ছেলেটি রিজেণ্ট পার্কের রেলিং টপকিয়ে বাগানে যে "রোলার" আছে তার মধ্যে শুয়ে থাকে। এদের সব বয়স প্রায়ই ১৪।১৫ কিন্তু কেহই এর আগে কখন কোন স্কুলে যায় নাই। কেহ বা হাল্কা বোঝা বয়, কেহ গাড়ীর ঘোড়ার তদারক করে, অধিকাংশ ছেলেরা চুরী করে।

সেই রাত্রে লর্ড সাফটসবেরী ওদের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগিলেন। তিনি প্রতি রাত্রিতে "র‍্যাগেড স্কুলে" আসতে লাগিলেন। তিনি এর জন্য অর্থ ব্যয় করতে লাগিলেন। স্কুলের শিক্ষক হবার জন্য অনেককে অনুরোধ করতে লাগিলেন। তিনি নিজে ছেলে মেয়েদের কাছে নানা গল্প, নানা দেশের কথা বলতেন। তাঁর চেষ্টায় ও যত্নে কয়েক বছরের মধ্যেই শুধু লণ্ডনসহরে ৮২ টা "র‍্যাগেড স্কুল" স্থাপিত হলো। আর ৮০০০ হাজার গরীব ছেলে মেয়েরা লেখা পড়া শিখতে লাগলো।

এখন স্কুলের ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শিক্ষকরাও হাসি মুখে শিক্ষা দেন। ছেলে মেয়েরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কুলে আসত। ছেঁড়া পোষাকে যতদূর পারে ভালকরে তালি দিত। লোকেরা তাদের জুতা, মোজা দিতে লাগিল। তাদের এমন শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো যে তারা ভবিষ্যতে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় কৃষিকার্য্য করতে পারে। এই সব স্কুলকে "সাফটসবেরী হোমস্" বলে। কারণ স্কুলের উন্নতির জন্য তাঁর মত আর কেহ পরিশম করে নাই।

স্মৃতি-কথা

রায় বাহাদুর প্রমদারঞ্জন রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাল রবিবার কাজে যাইবনা, সকলেই শ্রান্তক্লান্ত বিশ্রাম করিবে আর কাপড়চোপড় ধুইবে, জঙ্গলে তো আর ধোপা নাই। সন্ধ্যার সময় মাহুত আসিয়া বলিল, "হুজুর, গাঁয়ের লোক বলছে ঐ পাহাড়ে অনেক ভালুক আছে"। পাহাড়টা তাঁবু হইতে মাইল দুই দূরে, দিন দুই আগে ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ পথে ফিরিবার সময় একটা ভালুক দেখিয়াছিলাম। একজন গ্রামের লোক মাহুতের সঙ্গে আসিয়াছিল সে বলিল, "খুব ভোরে গেলে ভালুক আর বুনো মোষ দেখিয়ে দিতে পারি"। মাহুতকে বলিলাম, "আচ্ছা ভোরে ৪ টার সময় বেরোব"। অন্ধকার থাকিতেই বাহির হইলাম, সঙ্গে দুইটি হাতী, গ্রামের লোকটি আর দুই জন খালাসী।

প্রথমেই ঐ ভালুকের পাহাড়ে চলিলাম, সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই পাহাড়ের নীচে পঁহুছিলাম। পাহাড়ের নীচে নীচে হাতী চলিতে লাগিল, কাহারও মুখে টুঁ শব্দ-টি নাই। হটাৎ গ্রামের লোকটি আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল—অদূরে একটা উইএর ঢিপির গোড়ায় একটা কাল কিছু দেখা যাইতেছে। হাতী আরও একটু নিকটে গেলে দেখিলাম একটা ভালুক উইএর ঢিপিটা খুঁড়িতেছে। উইএর ডিম ভালুকের অতি প্রিয় খাদ্য। ৪০।৪৫ গজ দূরে হাতী কিন্তু ভালুকটার সে দিকে খেয়ালই নাই, এমনই আহারে মত্ত সে! হাতীটা আরও ২।৪ কদম কাছে গেল, আর নিকটে যাইবার চেষ্টা করিলে ভালুক পলাইবে। বন্দুক তুলিয়া লক্ষ্য স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! নূতন হাতী সম্ভবতঃ ভালুকের গন্ধ পাইয়াছে, বড়ই ছট্‌ফট্ করিতেছে—এক সেকেণ্ডও স্থির হইয়া দাঁড়ায় না! অতি কষ্টে মাহুত তাহাকে একটু শান্ত করিল, আমি তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব লক্ষ্য স্থির করিয়া ঘোড়া টিপিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে হাতীটাও তাহার মাথাটা একটু নাড়িল, ফলস্বরূপ গুলি ভালুকের মাথায় না লাগিয়া ৫।৬ ইঞ্চি সম্মুখে উইয়ের ঢিপিতে লাগিল আর কিছু বালি ছিট্‌কাইয়া ভালুকটার মুখে পড়িল। 'অত বড় আস্পর্দ্ধা কাহার'? দেখিবার জন্য সে মুখ তুলিল আর হাতী দেখিয়াই 'ঘোঁৎ' শব্দ করিয়া পলায়নের বন্দোবস্ত করিল। ভালুকটার পাঁজর লক্ষ্য করিয়া অন্য নল ছাড়িয়া দিলাম আর বিকট চিৎকার করিয়া ডিগ্‌বাজী খাইয়া ভালুকটা লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে পড়িল আর সমস্ত ঘাস বন তোল-পাড় করিতে লাগিল। মাহুত বলিতে লাগিল, "হুজুর, ফের মারো"। "না দরকার নাই, পড়িয়াছে"। ৫।৬ ফুট ঘাসের ভিতর কিছু দেখাও যাচ্ছিল না। ঘাস নড়া থামিয়া গেল, মরিয়া গিয়াছে। ততক্ষণে হাতী সেই জায়গায় পঁহুছিল, ভালুকের নামগন্ধ ও নাই। ঘাসের উপর গড়াইবার, ছট্‌ফট্ করিবার চিহ্ন রহিয়াছে বটে কিন্তু জানোয়ার নাই। সে হামাগুড়ি দিয়া, ভীষণ কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের একটা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। মনে হইল ঐটাই তাহার আস্তানা—lair। হামাগুড়ি দিয়া ছাড়া উহার ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব। আহত ভালুকের পিছনে ঐ কাঁটা আর গর্ত্তের ভিতর হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হইলনা—আমার সাহসে কুলাইলনা। ভালুকের চামড়াও আর আমার জুটিলনা।

আমার প্রধান আড্ডা—Head Camp, কয়েক মাস যমুনা মুখে ছিল। ভালুকের ভীষণ কাণ্ড যমুনা মুখে দেখিয়াছিলাম। যমুনামুখের একজন ফরেষ্ট গার্ড সন্ধ্যার সময় হরিণের সন্ধানে, নদীর অপর পারে সরিষার ক্ষেতে

গিয়াছিল। সকাল সন্ধ্যায় হরিণ সরিষার কচিপাতা খাইতে আইসে। ধীরে ধীরে জঙ্গলের কিনারায় কিনারায় চলিয়াছে, চোখ চারিদিকে ঘুরিতেছে, কোথাও হরিণ বাহির হইয়াছে কি না। ক্ষেতের পাশেই জঙ্গলের কিনারায় একটা পুরাতন উইএর ঢিপি, ঐ ঢিপিটার পাশদিয়া যাইবার সময় ভালুকের পায়ের দাগ তাহার চোখে পড়িল, আর ছোট জানোয়ারের 'কুঁ কুঁ' ডাক ও তাহার কানে গেল। চারিদিক দেখিয়া তাহার মনে হইল যে ঐ ঢিপিটার মধ্যে ভালুকের ছানা রহিয়াছে। সে নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তাহাদের আফিসে ফিরিয়া অসিয়া অন্য একজন ফরেষ্ট গার্ডকে ভালুকের ছানার কথা বলিল, এবং দুইজনে পরামর্শ করিল যে ভোরে তাহারা খুন্তি, কোদাল লইয়া, হাতিয়ারবন্ধ হইয়া যাইবে আর ঐ ঢিপি ঘুঁড়িয়া ভালুকের ছানা বাহির করিয়া আনিবে। আফিসের উপরওয়ালাদিগকে আর সে সব কথা জানাইলনা।

ভোরে উঠিয়া তাহারা চলিয়া গেল। সেই জায়গায় পঁহুছিয়া একজন গার্ড হাতের বন্দুক পাশে রাখিয়া, গর্ত্তের মুখ একটু ঘুঁড়িয়া লইয়া, উপুড় হইয়া গর্ত্তের মুখে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল ভালুকের ছানা গর্ত্তের ভিতর আছে কি না, তাহার শব্দ শোনা যায় কি না। অপর গার্ডটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিল হঠাৎ একটা কিছু তাহার চক্ষে পড়িল। ওটা কি দেখিবার জন্য সে একটু এগিয়ে গেল, আর সেই সময় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ভল্লুকী আসিয়া প্রথম গার্ডের পিছনে কামড়াইয়া ধরিল। লোকটি উলটিয়া পড়িয়া গেল আর হাত দিয়া তাহার মুখ চোখ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভালুকটা চিবাইয়া তাহার হাতখানা একেবারে গুঁড়া করিয়া দিল। ততক্ষণে অপর গার্ডটি ছুটিয়া আসিয়া হাজির হইল আর বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া এক গুলিতেই ভালুকটাকে মারিয়া ফেলিল।

প্রথম গার্ড অচৈতন্য, অন্য লোকটি ছুটিয়া গিয়া যমুনামুখে তাহাদের আফিসে খবর দিল আর সকলে মিলিয়া খাটিয়ায় তুলিয়া আহত ব্যক্তিকে লইয়া আসিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দুঃখের বিষয় বহু যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল না।

গোলাঘাট আর বড় পাথারের মাঝামাঝি গরম পানিতে একটা উষ্ণ প্রস্রবন আছে—Sulphur Spring। এই উষ্ণ প্রস্রবন হইতেই স্থানটির নামকরণ হইয়াছে গরম-পানি। বহুলোক এই উষ্ণ প্রস্রবনের জলে স্নান করিতে আইসে, ইহার জলের নাকি রোগ নিবারনী শক্তি আছে বিশেষতঃ চর্ম্ম রোগ। সরকারী জঙ্গলাত বিভাগের (Forest Department এর) একটা বাঙ্গলা ও সেই স্থানে আছে। ঐ বাঙ্গলায় আমি কয়েক দিন ক্যাম্প করিয়াছিলাম। একজন সার্ভেয়ারের কাজ দেখিতে যাইব, ৮ মাইল দূরে তাহার ক্যাম্প। ভোরে ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছি, সঙ্গে আমার সহীস ও আর একজন খালাসী। বড় পাথারের রাস্তায় চলিয়াছি। ঐ রাস্তায় এক জায়গায় বাঘের ভয় আছে, ফরেষ্ট বাংলার চৌকিদার দুই একবার আমাকে সে কথা বলিয়াছে আর সাবধান করিয়া দিয়াছে যেন অন্ধকারে হুশিয়ার হইয়া চলাফিরা করি। বেশ তাড়াতাড়ি চলিয়াছি, ডাকবাংলা হইতে ৪।৫ মাইল পথ গিয়াছি। খুব কোয়াসা, চোখে ১৫।২০ হাত দূরের জিনিষও ভাল করিয়া দেখা যায় না। ঘোড়ার পিঠে বসিয়া বসিয়া মনে হইতে লাগিল, "চৌকিদার না বলেছিল এই জায়গায় বাঘের ভয়"। পর মুহূর্ত্তেই রাস্তার একটা মোড় ঘুরিয়াছি আর কথা নাই বার্ত্তা নাই জঙ্গল হইতে লাফাইয়া থপ করিয়া মাঝ রাস্তায় পড়িল প্রকাণ্ড একটা বাঘ! একেবারে মুখোমুখী। আমরা তো থমকিয়া দাঁড়াইলাম, ভয়ে ঘোড়াটা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল, বাঘটা কিন্তু "হুপ্" বলিয়া আমাদিগকে গালদিয়া একলাফ দিয়া ঝপাং করিয়া জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়িল। কে যে বেশী ভয় পাইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

এই গরমপানিতে একটা মজার ঘটনা হইয়াছিল। সে বৎসরের মতো কাজকর্ম্ম শেষ হইয়াছে, সকল সার্ভেয়ারদের উপর হুকুম হইয়াছে, "গরমপানিতে আসিয়া জড় হও

মায়ের বিলাতের চিঠি

শ্রীকমলা দাস

আদরের বাবলু ও টুলটুল,

২৩ শে সকালে উঠেই আগে জানালার কাছে এসে পরদা সরিয়ে দেখি কি চমৎকার দৃশ্য চারিদিকের। চা খাওয়ার একটু পরে স্নান করতে হয়। লিফ্‌টে করে একেবারে মাটির তলায় (Under-ground floor এ) চালের ঘরের সামনে এলাম। প্রত্যেকের জন্য এক একটি ঘরে চালের ব্যবস্থা হয়েছে। বেশ বড় বড় ঘর। চৌবাচ্চা ঘরের মেঝের চেয়ে নীচু। সিঁড়ি দিয়ে নেমে তবে স্নান করতে হয়। প্রথমে জলে পা দিয়ে দেখি ভীষণ গরম জল, যেন কে ফুটিয়ে রেখেছে। দেখলাম পাশেই ঠাণ্ডা জলের কল রয়েছে, খানিকটা ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে তবে জলে নামা গেল। অনেক দিন পর বেশ আরাম করে স্নান করা গেল।

বিকালে নদীর ধার দিয়ে গিয়ে গ্রামের ভিতর অনেকটা হেঁটে এলাম। অনেক দিন হৈ চৈ গোলমালের ভিতর থেকে এখানে এসে খুব ভাল লেগেছে। আমরা যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম লোকে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। এ দেশের লোকে ভারতের পুরুষ হয়ত কেহ কেহ দেখেছে কিন্তু মেয়েদের খুব কম লোকেই দেখেছে। তাই আমরা তাদের কাছে দ্রষ্টব্য হয়েছি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অনেকে দল বেঁধে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলো। অনেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—আমরা কোথা থেকে এলাম কোথায় যাবো। তোমাদের দিদির চুলের বিণুনী ও তাতে আটকানো সোনার ফুল দেখে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। তোমাদের মেজমামা ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন "মানটু তোমার বিণুনীটা সাবধানে রেখো, না হ'লে, কখন দেখবে সোনার ফুলশুদ্ধ বিণুনীটি কেউ কেটে নিয়ে মিউজিয়ামে জমা দিয়ে দিয়েছে।"

২৪ শে সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি আকাশে ঘনঘটা করে মেঘ জমেছে আর অবিশ্রাম ঝুর ঝুর করে বৃষ্টি পড়ছে। এত ভীষণ ঠাণ্ডা যে বারহবার উপায় নাই। আকাশের অবস্থা দেখে মনের দুঃখে সারাদিনটা হোটেলেই কাটানো হলো।

২৫ শে সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি আকাশ রোদে ঝলমল করছে। দেখে খুব আনন্দ হলো। দুপুরের আগে স্নান খাওয়া শেষ করে এখানকার পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু যায়গায় যাবো বলে বার হলাম। রাস্তা পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে উঠেছে আর খুব খাড়াই। আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম। রাস্তায় যত লোকের সঙ্গে দেখা হতে লাগলো সবাই আমাদের হাসিমুখে অভিবাদন করে গেলো। অনেকটা উঠেই রেষ্টুরাণ্ট দেখলাম। এখানে একটি লোক তাঁর দুটি মেয়ে নিয়ে ঐ রেষ্টুরাণ্ট খুলে বসেছেন। অনেকেই ক্লান্ত হয়ে এখানে বসে চা খান।

আমাদের বিদেশী দেখে তাঁরা সকলে বাইরে এসে হেসে হেসে কত কথা বলতে লাগলেন; কিন্তু তাঁরা ভাল ইংরাজি না জানায় তাঁদের কথা বুঝতে পারছিলাম না।

আমরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই একটু বিশ্রামের লোভে সেখানে চা খেতে ঢুকলাম। একটি বড় হলে অনেকগুলি টেবিল চেয়ার। চারিদিক সুন্দর ফুলের গাছে সাজানো। বেশী আড়ম্বর নাই অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট্ট সুন্দর মেয়ে দুটি আমাদের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। আমরা তাদের আমাদের একখানা ফটো দিলাম আর তাদের একটি ফটো তুলে নিলাম। তারা আমাদের ফটো পেয়ে অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠলো। সেই ঘরে যতগুলি লোক চা খাচ্ছিলেন সবাই চেয়ে চেয়ে ফটোটি দেখতে লাগলেন। একটু পরেই মেয়ে দুটি তাদের হোটেলের একটি ছবি ও ছোট্ট পকেট আয়না এবং আমাদের দুজনকে দিয়ে গেল।

—ক্রমশঃ

কির্‌ঘিজদের দেশে

শ্রীসুবিমল রায়

সুইডেন-দেশীয় পর্য্যটক সোয়েন্ হেদিনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আগেই কিছু কিছু বলা হয়েছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কির্‌ঘিজদের দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কির্‌ঘিজদের দেশ পারস্য আর তুর্কীস্থানের উত্তরে। য়ুরাল নদীর ধার থেকে একটা প্রকাণ্ড শুক্‌নো মাঠ ক্যাস্পীয়ান সমুদ্রের উত্তর ধার দিয়ে আরাল হ্রদের ধার পর্য্যন্ত এসেছে। এই মাঠ প্রায় ১৩০০ মাইল লম্বা, কিন্তু চওড়া খুব কম। এইখানে কির্‌ঘিজরা থাকে। সোয়েন্ হেদিন লিখেছেন—"কির্‌ঘিজদের দেশ বড় মজার। সমস্ত দেশটা একটা মরুভূমির মতন মাঠ। গ্রীষ্মকালে সমস্ত দেশটাই প্রায় মরুভূমি হয়ে যায়। তখন চারদিকে শুধু বালি ধূ ধূ করে। আবার শীতকালে বরফ আর কুয়াসায় মরুভূমির শোভা অন্যরকম হয়। তখন বরফ প'ড়ে কির্‌ঘিজদের দেশের শুক্‌নো বালি আর ঘাস অনেকটা ঢেকে যায়। আবার বসন্তকাল এলে কোথা থেকে নানারকম গাছপালা আর সুগন্ধ ফুল এসে সেই মরুভূমির চেহারা একেবারে বদলিয়ে দেয়। তখন সমস্ত দেশটা সুগন্ধে ভ'রে যায়। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এলেই আবার মরুভূমির মতন অবস্থা হয়।"

সোয়েন্ হেদিন রুশদেশ থেকে রেলগাড়ীতে কির্‌ঘিজদের দেশের পশ্চিম সীমায় ওরেনবার্গ সহরে আসেন। ওরেনবার্গ সহর থেকে কির্‌ঘিজদের দেশে যেতে হ'লে ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে হয়। ওরেনবার্গে এসেই সোয়েন্ হেদিন বুঝলেন যে, তিনি কির্‌ঘিজ-দের দেশের খুব কাছে এসেছেন। এখানেই তিনি প্রথম কির্‌ঘিজদের দেখা পেলেন। তিনি লিখেছেন—"ওরেনবার্গে পৌঁছবার আগে রেলের লাইনের দুইধারে কেবল মাঠ আর রুশদেশীয় লোকদের ছোট ছোট গ্রাম দেখেছিলাম। সেই সব গ্রামের বেশীর ভাগ লোক চাষা, তাদের বড় বড় দাড়ি আর মাথায় টুপী। প্রত্যেক গ্রামে একটি গির্জা; এই সব গির্জার চূড়ো দেখতে অনেকটা পেঁয়াজের মতন। চারদিন রেলগাড়ীতে ছিলাম, চারদিনই এই একই রকম দৃশ্য দেখেছিলাম। কিন্তু ওরেনবার্গে পৌঁছিয়েই বুঝলাম যে, অন্যরকম যায়গায় এসেছি। এখানে রুশদেশের লোক ছাড়া কির্‌ঘিজ আর তাতারদের দেখা পেলাম। এখানে তাতার আর কির্‌ঘিজদের মস্‌জিদ আছে; তাতারদের একখানা বড় আর খুব সুন্দর মস্‌জিদ আছে। তা ছাড়া রুশদেশীয় লোকদের হোটেলে গির্জা আছে।"

সোয়েন্ হেদিন ওরেনবার্গ থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে কির্‌ঘিজদের দেশে ঢুকলেন। ওরেনবার্গ থেকে বেরিয়েই দেখলেন যে, তিনি এক প্রকাণ্ড মরুভূমির মতন মাঠের মধ্যে এসে পড়েছেন। এই রকম মাঠকে ষ্টেপ্ বলে। এখানে কির্‌ঘিজরা তাঁবু খাটিয়ে থাকে। তাঁবুই তাদের বাড়ীর অভাব দূর করে। তখন শীতকাল; বরফে প্রায় সমস্ত মাঠ ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল। খানিক পরে রাত হয়ে গেল; তখন বরফের উপরে চাঁদের আলো প'ড়ে সমস্ত মরুভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সোয়েন্ হেদিন গাড়ীতে ব'সে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে গাড়ী এক একটা ষ্টেশনে থামছিল। কির্‌ঘিজ-

দের দেশে ষ্টেশন বল্‌তে ঘোড়ার গাড়ীর ষ্টেশন বোঝায়। এই ষ্টেশন আর কিছুই নয়, একটা ছোট সাদা ঘর, সেখানে ষ্টেশন মাষ্টার থাকে আর দরকার হ'লে পথিকরাও থাকতে পারে। তার পাশেই ঘোড়া আর গাড়ী থাকবার ঘর। প্রত্যেক ষ্টেশনের কাছে কির্‌ঘিজদের গ্রাম; সেই গ্রাম আর কিছুই নয়, সারি সারি তাঁবু।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সোয়েন্ হেদিন দেখলেন যে, একটা বড় ষ্টেশনে এসেছেন। সেখানে একজন বুড়ো দাড়িয়াল্ রুশদেশীয় লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। সোয়েন্ হেদিনকে দেখে বৃদ্ধটি বল্‌লেন, "আজ উপবাসের দিন, তাই বড় অসুবিধা হচ্ছে। তবে আজ মাছ খাওয়া বারণ নয়, মাছ পাওয়া গেলে বেশ হ'ত।" সোয়েন্ হেদিনের সঙ্গে টিনে-বন্ধ মাছ ছিল, তিনি সেই মাছ বৃদ্ধকে খেতে দিলেন। বৃদ্ধটি মাছ খেয়ে বড় খুসী হ'লেন আর অনেক ধন্যবাদ দিলেন। তারপর বৃদ্ধটি ১৫ মিনিটের মধ্যে ১১ পেয়ালা চা খেয়ে ফেল্‌লেন।

সোয়েন্ হেদিনের গাড়ী আবার চলতে লাগ্‌ল। ২ দিন পরে ওরেনবার্গ থেকে আরও ১৭৫ মাইল দূরে এসে তিনি অরস্ক্ সহরে পৌঁছালেন। এই ষ্টেশনটা বেশ বড়; পাহাড়ের উপরে সহর, আর পাহাড়ের চূড়ায় একটি সুন্দর গির্জা। কির্‌ঘিজদের দেশে ৯৬টা ষ্টেশন কিন্তু ৫টা কি ৬টা মাত্র সহর। অরস্ক্ সহরে সোয়েন্ হেদিন গাড়ীর ঘোড়া বদল ক'রে নিলেন আর গাড়ীর চাকায় তেল দিয়ে নিলেন। তার পর আবার গাড়ী চলতে লাগল। বাগুটি-সাই ষ্টেশনে তিনি কির্‌ঘিজদের 'ফটো' তুলে নিলেন। এদের চেহারায় মোঙ্গলিয়ান ভাব আছে অর্থাৎ এদের চেহারা কতকটা চীনে, বর্ম্মি আর ভুটিয়াদের মতন। এদের চেহারা সেই রকমই হবার কথা। কির্‌ঘিজেরা প্রথমে চীনদেশের উত্তরে আল্‌টাই পর্ব্বতের আশে-পাশে থাকৃত। কিন্তু পরে বহুকাল ধরে তারা ক্যাস্পীয়ান সাগর আর আরাল হ্রদের ধারে থাকে। সেখানে তুর্কি জাতির নানা শাখার সঙ্গে মিশে এদের চেহারা কতকটা বদলিয়ে যায়। কির্‌ঘিজেরা মুসলমান হয়েছে, মুসলমান আচার-ব্যবহারের ফলেও এদের চেহারা কতকটা বদলিয়েছে। এরা পুরোমাত্রায় মুসলমান নয়; এদের ধর্ম্মে নানারকম পাহাড়ী ধর্ম্ম মিশে গিয়েছে। সোয়েন্ হেদিন লিখেছেন,—"কির্‌ঘিজেরা একটু বুনো ধরণের, কিন্তু এদের মন খুব ভাল। এরা খুব পরিশ্রমী আর সুস্থ। এরা নিজেদের 'কাইসাক্' অর্থাৎ 'সাহসী' বলে। এরা তাঁবুতে থাকে। ছাগল, ভেড়া, উট আর ঘোড়া এদের প্রধান সম্পত্তি। এদের দৃষ্টিশক্তি খুব বেশী। মরুভূমিতে এরা পথ হারায় না। বালির উপরে সামান্য আঁচড়ের দাগ, শুক্‌নো ঘাস ইত্যাদি দেখে এরা অনায়াসে পথ চিনে নিতে পারে।"

তাম্‌ডি ষ্টেশনে সোয়েন্ হেদিন রাত কাটালেন। সকালে উঠে দেখেন যে, বরফের উপরে নেকড়ে বাঘের পায়ের দাগ রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, পাশেই কির্‌ঘিজদের তাঁবু থেকে নেকড়ে বাঘে হাঁস চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে। তাম্‌ডি ষ্টেশনের কাছেই একটা ছোট নদী। সোয়েন্ হেদিন সেখানে বেড়াতে গেলেন। সেখানেও নেকড়ের পায়ের দাগ দেখতে পেলেন। এ সব জায়গায় নেকড়ে আর শেয়াল প্রায়ই দেখা যায়। তা ছাড়া বুনো খরগোস, হরিণ আর নানা রকম পাখীও দেখা যায়। সোয়েন হেদিনের গাড়ী আবার চল্‌তে লাগল। দিনের বেলায় শুক্‌নো মাঠ, মরুভূমি আর কির্‌ঘিজদের তাঁবু ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না, কিন্তু রাত হ'লেই বরফ পড়ে আর বরফের উপরে চাঁদের আলো প'ড়ে সমস্ত মরুভূমি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সোয়েন্ হেদিন লিখেছেন, "আমি গাড়ীতে কম্বল

মুড়ি দিয়ে ব'সে চাঁদের আলোয় বরফের শোভা দেখি। আবার গাড়ীর চাকায় যখন কড় কড় শব্দে বরফ ভাঙ্গে, তখন তাও শুনতে বেশ লাগে। সকাল হ'লেই নেকড়ে বাঘেরা কির্‌ঘিজদের তাঁবু থেকে পালিয়ে যায়, খালি বরফের উপরে তাদের পায়ের দাগ থাকে। তার পর সেই বরফও গ'লে যায়।"

কিছু দিন পরে তিনি ইর্‌ঘিজ ষ্টেশনে এলেন। এই ষ্টেশন থেকে কিছু দূর গিয়ে সন্ধ্যার সময়ে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। তিনি লিখেছেন—"সমস্ত মরুভূমি নীল আলোয় ভ'রে গেল। সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে আর সমস্ত আকাশ গাঢ় নীল আলোয় ভ'রে যাচ্ছে। তখন একটা ছোট পাখীকে হাতীর মতন প্রকাণ্ড দেখাচ্ছিল, দূরের এক জন মানুষকে দৈত্যের মতন প্রকাণ্ড দেখাচ্ছিল। দূরের উট আর ঘোড়াগুলোকে পাহাড়ের মতন বড় দেখাচ্ছিল। তার পর রাত হয়ে এল, তখন সব ঠিক ঠিক দেখা যেতে লাগল। এ রকম দৃশ্য আর দেখি নি।"

তার পর তিনি কারাকুম্ মরুভূমির ধারে এলেন। এই মরুভূমি ক্যাস্পীয়ান সাগর আর আরাল হ্রদের মাঝখানে। এখানে তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে নিয়ে উট জুড়ে দেওয়া হ'ল। কারাকুম মরুভূমিতে তিনি এমন সব জিনিষের চিহ্ন দেখতে পেলেন যাতে বুঝলেন যে, সেখানে অনেক দিন আগে সমুদ্র ছিল। বোধ হয় ক্যাস্পীয়ান সাগর আর আরাল হ্রদ আগে একসঙ্গে জোড়া ছিল। কিছু দিন পরে তিনি আরাল হ্রদের ধারে এলেন। আরাল হ্রদের আশে-পাশে খুব ছোট ছোট কতকগুলি হ্রদ দেখলেন। এই সব হ্রদ আগে আরাল হ্রদের অংশ ছিল। বছরের পর বছর প্রতি গ্রীষ্মকালে অনেক বালি বাতাসে উড়ে এসে আরাল হ্রদে পড়ে আর ছোট হ্রদগুলিকে আরাল হ্রদ থেকে একেবারে তফাৎ ক'রে ফেলে।

সেখান থেকে তিনি তুর্কিস্থানে যান। পরে চীন-তুর্কিস্থানে যান।

স্মৃতি-কথা

রায় বাহাদুর শ্রীপ্রমদারঞ্জন রায়

এক জায়গায় শীকার করিতে গিয়া বড়ই জব্দ হইয়াছিলাম। সার্ভেয়ারের কাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। সমান জমি (পাহাড় নাই), তাহাতে দুই চারিটা ছোট নদী আর অসংখ্য ছোটবড় বিল, সব জুড়িয়া নলখাগড়ার বন—১০।১২ ফুট উঁচু। বিলের ধারে "খুঁটি" (মহিষওয়ালাদের আস্তানা) আছে, তাহাতে ৫০।৬০টা করিয়া পোষা মহিষ আর রাখাল, দূরে দূরে ২।৪টা গ্রামও আছে। একটা বিলের ধারে আমাদের তাঁবু ফেলিয়াছে। বিকালে যখন তাঁবুতে পৌঁছুছিলাম তখনও বেশ আলো আছে। কাজ করিবার সময় বিলে অনেক হাঁস দেখিয়াছিলাম, একটা হাঁস মারিয়াছিও। তাঁবুতে পঁহুছিয়া সার্ভেয়ারকে বলিলাম, "নৌকা পেলে হাঁস শীকার করা যেত"। সার্ভেয়ার খুঁটি হইতে নৌকা যোগাড় করিয়া আনিল। আমরা হাঁস মারিতে চলিলাম, সার্ভেয়ার সঙ্গে চলিল। সার্ভেয়ারটি

মুসলমান, হালাল না করিলে সে খাইবে না। তাঁবু হইতে অল্প পথ গিয়াই দেখিলাম সম্মুখে, প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাইল দূরে, বিলে বড় বড় শাদা রংএর পাখী রহিয়াছে। দূরবিন লইয়া দেখিলাম "ভেলা" (গগনবেড়—Pelican)। ছেলে বেলায় দেশে দল বাঁধিয়া ভেলা উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি, লোকেদের বলিতে শুনিয়াছি খাইতে নাকি অতি উপাদেয়! বড়ই লোভ হইল। প্রকাণ্ড জীব, এক একটাতে প্রায় ৫।৭ সের মাংস হইবে। মাঝিকে বলিলাম, "ঐ দিকে চল, ভেলা মারব।" 'কাছে যাও' বলা যত সোজা, কাছে যাওয়া তত সহজ নহে। আমরা যতই অগ্রসর হই পাখীগুলিও ততই দূরে চলিয়া যায়, আমাদের মধ্যের ব্যবধানটা যেন আর কমে না। অতিকষ্টে অনেক রকম কারসাজি করিয়া ৪০।৪৫ গজের মধ্যে পঁহুছিলাম; আর নিকটে যাওয়া অসম্ভব, কোনও অবলম্বন নাই যাহার আড়ালে লুকাইয়া অগ্রসর হইব। সব পাখীরই পিঠ আমাদের দিকে এই যা অসুবিধা! যাহা হউক, বন্দুকে ২নং ছিটা ভরিয়া, লক্ষ্য স্থির করিয়া ঘোড়া টিপিলাম। বন্দুক আওয়াজ হইল আর সব পাখী উড়িয়া চলিয়া গেল, একটিও পড়িল না। পাখীগুলি প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাইল উড়িয়া গিয়া আবার জলে বসিল। এইবার একটু সুবিধা হইল, টুকরা টুকরা নলখাগড়ার ঝোপ ছিল আশেপাশে, তাহারই আড়ালে নৌকা চালাইয়া যখন আবার খোলা জায়গায় বাহির হইলাম তখন পাখীগুলি ২০।২৫ গজ মাত্র দূরে। বন্দুক তুলিয়া আবার আওয়াজ করিলাম, এবারেও কোন্‌ও ফল হইল না। দরমার উপর কাঁকর ছুঁড়িয়া মারিলে যেমন আওয়াজ হয় শুধু সেই রকম একটু আওয়াজ হইল। পাখী তো উড়িল, আমিও অন্য 'নাল' ছাড়িলাম। গুটি ৩।৪ পালক পড়িল মাত্র, পাখীগুলি দিব্য উড়িয়া চলিয়া গেল। ২ নং ছিটা তাহাদের পালক ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিতে পারিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, দেড় ঘণ্টা সময় ভেলার পিছনে নষ্ট করিয়াছি, এখন কি খালি হাতে তাঁবুতে ফিরিয়া যাইব? পথে দুইটি ছোট হাঁস মারিয়া লইলাম।

তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু মেজাজটা বড়ই খাপ্পা। এমন জব্দ আর কখনও হই নাই। ইহার একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন চারিদিক কোয়াসায় ঢাকা। বিছানায় শুইয়া একটা সোঁ সোঁ, ফর্ ফর্ শব্দ কানে আসিতেছিল যেন বহুতর পাখী উড়িয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্যা হ্যায় রে"? "ভেলা হ্যায়, হুজুর"। তাঁবুর বাহিরে আসিলাম। মাথার উপর দিয়া সোঁ সোঁ শব্দে শত শত পাখী হাঁস, ভেলা ইত্যাদি, উড়িয়া যাইতেছে। মারা অসম্ভব, কোয়াসায় ভাল করিয়া দেখা যায় না যে কত উঁচুতে। হাত মুখ ধুইয়া চা খাইতে বসিয়াছি। একজন খালাসী আসিয়া খবর দিল, "হুজুর ভেলা।" তাঁবুর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম এক-চতুর্থাংশ মাইলটাক দূরে, জলের উপর শত শত ভেলা সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে; ক্রমাগত জলে মাথা ডুবাইতেছে আবার তুলিতেছে—শীকারে ব্যস্ত। আমি আর সার্ভেয়ার আর একজন খালাসী নৌকায় উঠিলাম। আগের দিনের দুরবস্থা আমার স্মরণ ছিল, তাই আজ হুঁসিয়ার হইয়াছি। বন্দুকের একনলে গুলি (lethal bullet) আর অপর নলেতে কালপিন (buck shot) ভরিয়া লইয়াছি—দেখিব আজও উড়িয়া চলিয়া যায় কি না! ভেলাগুলি বড়ই ব্যস্ত, আমাদিগকে লক্ষ্যই করিতেছে না। আমরা খুব নিকটে পঁহুছিয়া গিয়াছি—৩০।৩২ গজ হইবে, তখন তাদের খেয়াল হইল আর অমনি ৮।১০টা পাখী

একসঙ্গে ডানা মেলিল—এই উড়িল উড়িল আর কি। আমিও ইহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। দুই একটা হয়ত বা জল হইতে ২।৪ ফুট উপরে উঠিয়াছে, বেশীর ভাগই তখনও জলের উপর, ডানাখোলা অবস্থায়। তাহাদের মাঝখানটা লক্ষ্য করিয়া, 'গুড়ম্' করিয়া গুলিভরা কার্ত্তুজ ছাড়িলাম। কয়েকটা পাখী এলাইয়া পড়িল আর বাকি সব সোঁ সোঁ শব্দে উড়িল। ১০।১৫ ফুট উঁচুতে উঠিতে না উঠিতেই 'কালপিন' (buck shot) ছাড়িয়াছিলাম। আরও কয়েকটা ঝুপ ঝাপ জলে পড়িল। যে কয়েকটা জীবন্ত ছিল সার্ভেয়ার সেগুলিকে হালাল করিল।

ভেলা তো শীকার করিলাম। তাঁবুতে ফিরিয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিলাম, ২।৩টা পাখী আফিসের বাবুদের জন্য গৌহাটী পাঠাইয়া দিলাম। সকলেরই আজ মহা আনন্দ, আজ খুব ভোজ হইবে!

সন্ধ্যার সময় কাজ হইতে ফিরিয়া, স্নান করিয়া খাইতে বসিলাম। মাংস রান্না করিয়াছে। মাংস মুখে দিয়া তো একেবারে অবাক! এ তো মাংস নহে, ঠিক যেন জুতার 'সুখতলা'! আর যা গন্ধ! বাপ! খায় কাহার সাধ্য, একেবারে যেন নাড়িভুঁড়ি উল্টাইয়া আইসে! খালাসীরাও কেহই খাইতে পারিল না। "আর কেঁউ নহি খায়া"? "বহুৎ বদবুই হ্যায়, হুজুর, ঔর বিলকুল সিজা নহি" সিদ্ধ হয় নাই। সকলের মুখেই ঐ এক কথা, "একেবারে অখাদ্য।"

হাজারিবাগের ভুঁইয়া, সাঁওতালরাও খাইতে পারিল না—সে যে কেমন মাংস তাহা বুঝিতেই পারিতেছ।

ক্রমশঃ

খোকার ছড়া

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়

কাক কালো
কোকিল কালো
আর কালো কে ?
এ পারের মেয়ে।
হেথা নয়
হেথা নয়
খোকনের বে।

পলাশ লাল
গোলাপ লাল
আর লাল কে ?
ও পারের মেয়ে।
হোথা হোক্
হোথা হোক
খোকনের বে।

বাদল কাঁদে
আঁধার কাঁদে
আর কাঁদে কে ?
এ পারের মেয়ে।
হেথা নয়
হেথা নয়
খোকনের বে।

চাঁদ হাসে
তারা হাসে
আর হাসে কে ?
ওপারের মেয়ে।
হোথা হোক্
হোথা হোক
খোকনের বে।

জন্মদুঃখী

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

মাঝি লগির মাথার লোহার হুক পুলের দেয়ালে সজোরে চেপে ধরতে গেল। কিন্তু তার পা গেল ফসকে। সে নৌকোর ছাদে একেবারে চিৎ হ'য়ে পড়ে গেল। ভিক্টর চীৎকার করে বলে উঠলো—

"মাঝি লগি চালাও।"

'বেল্‌নিভারনে' একেবারে পুলের ভিতরে এসে পড়েছে। ভিক্টর উপরে তাকিয়ে সভয়ে দেখলো পুলের খিলেন প্রায় তার ঠিক মাথার উপরে। ভিক্টর পূর্ব্বেই নৌকোর লম্বা হাল নামিয়ে রেখেছিল। নৌকো স্রোতের বেগেই চলতে লাগলো।

খিলেনের পর খিলেন। ক্রমশঃ পুলের ভিতরের অন্ধকার কেটে যেতে লাগলো। সামনে মনে হলো অনেকটা ফাঁকা জায়গা যেন দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ উজ্জ্বল আলোতে ভিক্টরের চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেলো। পুলের উপর হ'তে সে শুনতে পেলো বহুকণ্ঠের আনন্দধ্বনি। তীরের অদূরবর্ত্তী গির্জ্জাঘরের উচ্চ চূড়া তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

পুলের ভিতর থেকে নৌকো বের হ'য়ে আসতেই উপরের লোকের ভিড় হ'তে একটা দড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো নৌকোর উপর। ভিক্টর নিমেষের মধ্যে সেই দড়ি চেপে ধরে নৌকোর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললো। নৌকোটা মুহূর্ত্তের মধ্যে স্থির হয়ে গেলো।

দেখতে দেখতে 'বেল্‌নিভারনের' মুখ গেলো ঘুরে। এবার আর স্রোতের টানে নয়, তীর হ'তে দড়ির টানে নৌকো ধীরে ধীরে তীরের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। অবশেষে ১৫ বৎসরের কাপ্তেন ও শিশু নাবিকদলকে নিয়ে বেল্‌নিভারনে তীরে এসে ভিড়লো।

সন্ধ্যের সময় নৌকোর কামরায় টেবিলে সকলে মিলে যখন খেতে বসলো তখন তাদের মনে সে কী আনন্দ! এবার বেল্‌নিভারনেকে বাঁধা হয়েছে খুঁটির সঙ্গে খুব শক্ত ক'রে। শিকল ছিঁড়বার আর কোন ভয় নেই।

টেবিলে সকলের মাঝখানে জায়গা হয়েছে ভিক্টরের বসবার। সেই সম্মানিত আসনে সে আজ বসেছে জাহাজের কাপ্তেনের মতো। সকালটা আজ তাদের যেরূপ উত্তেজনায় কেটেছে তাতে তাদের আজ ক্ষিধে পাবার কথা নয়। তবু তাদের সকলেরই মন উৎসাহে পূর্ণ। একটা ঘোর বিপদ কেটে গেলে মনে মনে স্বস্তির ভাব আসে—তাদের আজ মনের অবস্থা তেমনি।

টেবিলের এক কোণ থেকে লুভো একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো। তার মনের ভাব ভিক্টরকে যদি থানায় নিয়ে যাওয়া হতো তাহ'লে আজ কী হ'তো?

লুভোর মুখে আবার সেই আকর্ণবিস্তৃত হাস্য ফুটে উঠেছে। সে তার বাচ্চাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, চোখে তার আনন্দাশ্রু। তাদের দেখলে মনে হবে জগতে তারাই যেন সব চেয়ে সুখী অথবা লটারীতে যেন তারা খুব মোটা রকমের একটা টাকা জিতেছে। অথবা বেল্‌নিভারনে'র সব ফুটো যেন বন্ধ হ'য়ে গেছে।

লুভো বারবার তার সিগারেটের পাইপটা

ভিক্টরের বুকে ঠুকে ঠুকে (বেশী আনন্দ হ'লে সে এ রকম করে) বলতে লাগলো—"ভিক্টরের মতো এমন ছেলে কি আর একটিও আছে? উঃ হালটা সে কী দৃঢ় মুষ্টিতেই না ধরেছিলো, আর কী জোরেই না তাতে সে দিচ্ছিলো ঝাঁকুনি। কি হে মাঝি নৌকোয় তো তুমি ছিলে, বল না হে। আমার যে এমন পাকা হাত আমিই কি এমন পারতাম!"

১৫ দিন ধরে সে কোন কাজকর্ম্মই করলে না। বন্দরে ঘুরে ঘুরে সকলের কাছে সে কেবল ভিক্টরের প্রশংসাই ক'রে বেড়াতে লাগলো।

"দেখেছিলে তো হে নৌকাটো তো প্রায় স্রোতে ভেসেই গিয়েছিলো। তার পর সে···উঃ···"

বাকিটুকু সে হাত মুখ নেড়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলে।

এদিকে ক্রমে ক্রমে সাইনের জলও কোমে আসতে লাগলো। তখন আবার যাত্রার আয়োজন হ'তে লাগলো। একদিন ভিক্টর ও লুভো নৌকোর জল সিঁচে ফেলছে এমন সময় পিয়ন এসে লুভোর হাতে দিল একটি চিঠি।

চিঠির উপরে নীল রঙের ছাপ। এ সরকারী চিঠির চিহ্ন। লুভো তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে ফেললো। কিন্তু তার বিদ্যের দৌড় ছিল পাটী-গণিতের আঁকের সংখ্যা পর্য্যন্ত। তাই সে চিঠি-খানা ভিক্টরের হাতে দিয়ে বললো—"তুই পড়তো বাছা।"

ভিক্টর চিঠিটা পড়লো :—

পুলিশ সাহেবের অপিস।

১২ই.

"বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে ফ্রান্সিস্ লুভোকে জানান যাইতেছে সে যেন অবিলম্বে অপিসে এসে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে।"

"এই সব?"

"হাঁ।"

"পুলিশ সাহেবের আবার আমাকে দিয়ে কী প্রয়োজন হলো?"

সমস্ত দিন লুভোর দেখা পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যের সময় যখন সে ফিরে এলো তখন দেখা গেলো তার মুখে হাসি নেই, মন ভারাক্রান্ত, মেজাজ চটা।

মা-লুভো এ পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝে উঠতে পারলেন না। রাত্রিতে ছেলেমেয়েরা সকলে ঘুমোলে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হঠাৎ তোমার কী হলো? মুখ অত ভার কেন?"

"না, আমি আর পারি নে।"

"কি পার না, কাঠ নামাতে?"

"না না, এই ভিক্টরটাকে নিয়ে!"

তার পর সে যে পুলিশ সাহেবের কাছে গিয়েছিলো, সেখানে যা শুনে এলো সব মা-লুভোকে বললো।

"জানো, যে স্ত্রীলোকটা ভিকটরকে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিলো সে তার মা নয়।"

"মা নয়, সত্যি?"

"সে তাকে এনেছিলো চুরি ক'রে।"

"এ সব কথা তারা কী ক'রে জানলো?"

"সে স্ত্রীলোকটাই সব বলেছে।—হাঁসপাতালে মরতে বসে তার মনে অনুশোচনা জাগে। তখন সে পুলিশ সাহেবকে সব কথা বলেছে।"

"পুলিশ সাহেব তবে তার মা-বাপের নাম তোমাকে বলেছে?"

এ কথায় হঠাৎ সে কেমন ভীত শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। মা-লুভোর উপর হঠাৎ চটে গিয়ে সে ব'লে উঠলো—"পুলিশ সাহেব কি বলেছে সে কথা তোমার শোনবার কী প্রয়োজন?"

এই ব'লে সে ঘর হ'তে বের হ'য়ে রেগে ধপাস ক'রে সজোরে দরজাটা দিল বন্ধ ক'রে।

মা-লুভো তার স্বামীকে পূর্ব্বে কখনো এমন রাগতে দেখেন নি। লুভোর রাগ দেখে তিনি অবাক হ'য়ে গেলেন।

"ওর আজ হলো কি?" সত্যি, লুভোর আজ কী হলো? কথায়, আচরণে, চলাফেরায় পূর্ব্বের লুভো যেন আর নেই। দিনরাত সে চটেই থাকে, রাত্রে ঘুমোয় না, খাওয়া গেছে কমে, রাত্রে ঘুমের ঘোরে বিড়্ বিড় ক'রে কেবলি বকে। স্ত্রীকেও সে এখন দু'কথা শুনিয়ে দেয়, মাসীকে করে যখন তখন তম্বি। সব চেয়ে বেশী রাগ তার ভিক্টরের উপর।

মা-লুভো অবাক হ'য়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলো "তোমার হ'ল কি?"

লুভো রেগে তেড়েমেড়ে ব'লে উঠলো—"হবে আবার কি? দিনরাত কেবল এই এক কথা ব'লে আমাকে তোমরা জ্বালাও কেন? আমার কিছু হয় নি। আমাকে আর এমন জ্বালিও না।"

মা-লুভো এবার একেবারে হতাশ হ'য়ে গেলেন।

"নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।"

একদিন মোজাঁদ্রোর কথা হ'তেই সে রেগে এমন তেড়েমেড়ে উঠলো যে মা-লুভোর মনে আর সন্দেহ রইলো না। নিশ্চয়ই তার স্বামীর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

তাদের নৌকো করবাইনিতে এসে পৌঁছলো। ভিক্টর ও ক্লেরার মনে আনন্দ আর ধরে না। আবার তারা স্কুলে যাবে, আবার কাঠের গুদামে মোজাঁদ্রোর সঙ্গে তাদের দেখা হবে।

একদিন সে-কথা বলতেই লুভো রেগে ব'লে উঠলো—"দেখো, তোমরা মোজাঁদ্রোর নাম আমার কাছে করো না। ও বেটার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই।"

মা-লুভো বাধা দিয়ে বললেন—"কেন, মোজাঁদ্রো তোমার কী করেছে?"

"করেছে···করেছে। দেখো, তোমরা আমার সব কথার জবাব দিয়ো না। তোমরা ভুলে গেছো আমি বাড়ির কর্ত্তা!"

সত্যি সে কর্ত্তাই বটে। এবার সে করবাইনিতে এসে পূর্ব্বের জায়গায় নৌকো না বেঁধে, নৌকো নিয়ে গেল আরো আধ মাইল দূরে একেবারে বনের ধারে। সেখানে গিয়ে সে নির্জ্জন নদীতীরে নৌকো বাঁধলো।

সে ব'লে দিলো মোজাঁদ্রোর সঙ্গে সে আর কাঠের কারবার করবে না, সে বড় ঠকায়। সে এখন আর একজন নূতন ব্যক্তির সঙ্গে কাঠের কারবার করবে।

এবার করবাইনিতে এসে ভিক্টর ও ক্লেরার আর স্কুলে যাওয়া হলো না। কারণ এবার নৌকো যেখানে বাঁধা হয়েছে সেখান থেকে স্কুল অনেক দূরে। তাই এখন তারা দু'জনে মিলে বনের মধ্যে যায় বেড়াতে। সেখানে তারা ঘুরে ঘুরে শুকনো ডালপালা কুড়োয়, শ্রান্ত হ'লে দু'জনে বসে ঘাসের উপর। ভিক্টর পকেট থেকে বই বের ক'রে ক্লেরাকে বলে পড়তে। সে পাশে বসে শোনে।

ডালের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো বইয়ের পাতায়, তাদের মাথায় প'ড়ে নাচতে থাকে। বনের ভিতর থেকে ওঠে কাঁট পোকার অসংখ্য গুঞ্জনধ্বনি, চারদিকের নিঝুম নিস্তব্ধতায় তাদের মনে জাগে আবেশ।

কখনো তাদের ফিরতে দেরী হ'য়ে যায়! তাড়াতাড়ি নৌকায় পৌঁছবার জন্য তাঁরা ছুটে চলতে থাকে। তখন বনের ভিতরে গাছে গাছে তারা খায় ধাক্কা, দূর থেকে তারা দেখতে পায় নৌকার কাছে নদীতীরে আলো জ্বলছে।

মা-লুভোর এ রান্নার আগুন। তিনি এখন

প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় নদীতীরে খোলা জায়গায় শুকনো কাঠের আগুন জ্বেলে রান্না করেন।

আগুনের ধারে মা-লুভোর গা-ঘেঁসে বসে আছে মিমিল। উস্কু খুস্কু চুল নিয়ে, গায়ে একটা আঁট জামা পরে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। সকলের ছোটটি মায়ের কাছে ঘাসের উপর দিচ্ছে গড়াগড়ি। অদূরে লুভো ও মাঝি নীরবে বসে পাইপ টানছে।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় সকলে খেতে বসবে এমন সময় কে যেন আসলো। সকলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

"এ যে মোজাঁদ্রো?"

হাঁ, মোজাঁদ্রোই বটে। বেচারা এই কয়দিনে অনেকটা বুড়িয়ে গেছে, মুখ গেছে শুকিয়ে। লাঠিতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে কুঁজো হয়ে চলছে। কথা বলতেও যেন তার কষ্ট হয়।

সে লুভোর কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো—"লুভো, তোমরাও আমাকে ছাড়লে?"

লুভো অপরাধীর মতো বললো—"না না, তোমার উপর তো আমি রাগ করি নি।"

মোজাঁদ্রোকে এতটা রুগ্ন ও ক্ষীণ দেখে মা-লুভোর মনে বড় মায়া হ'তে লাগলো। মোজাঁদ্রোর উপর স্বামীর রাগ আছে জেনেও তিনি তাকে বসতে একটা টুল এনে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনার কি কোন অসুখ করেছে?"

"হাঁ, কাশিতে বড় কষ্ট পাচ্ছি।"

তিনি অতি নিম্নস্বরে এক রকম ফিস্ ফিস্ করেই কথা বলতে লাগলেন। সে বললে সে আর বেশী দিন এখানে থাকবে না, শীগ্‌গিরই সে অন্যত্র চলে যাবে।

"আমার সব শেষ হ'য়ে গেছে। কারবারও আমি তুলে দেবো। টাকার আমার অভাব নেই, আমি যথেষ্ট টাকা জমিয়েছি। টাকার আর আমার দরকারই বা কি? যে সুখ আমি হারিয়েছি, টাকায় কি তা আমি ফিরে পাবো?"

লুভো কাছে বসে চোখের ভুরু কুঁচকিয়ে মোজাঁদ্রোর কথা শুনতে লাগলো। (ক্রমশঃ)

তারার আলো ও উত্তাপ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকালে তারাগুলিকে দেখায় গ্যাসের শুভ্র একবিন্দু আলোর টুকরোর মত। কিন্তু সব তারার আলোই এমন শুভ্র নয়। একটু নিবিষ্ট মনে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায় কোন কোনটার আলো ঈষৎ লাল, কোনটার আলো ঈষৎ হলদে, কোনটার আলো ঈষৎ নীল, কোনটার আলো পাকা কমলালেবুর রঙের মতো। দূরবীনের ভিতর দিয়ে কোন কোন তারার রং দেখায় রক্তের মতো লাল। আমাদের সূর্য্য হলদে তারার দলে।

লোহাকে আগুনে পোড়ালে, প্রথমে দেখতে হয় লাল, তার পর যতই উত্তাপ বাড়তে থাকে ততই তার রং বদলে প্রথমে হয় হলদে তার পর হয়

সাদা। তপ্ত লোহার গায়ের রং দেখে এর তাপের মাত্রা বুঝতে পারা যায়। তেমনি তারাগুলির আলোর রং দেখলেও বুঝতে পারা যায় কোন্ তারার তাপ কি পরিমাণ।

যে-তারাগুলি দেখতে লাল তাদের তাপের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। কম হ'লেও কোনটারই তাপের মাত্রা ৫০০০° ডিগ্রীর কম নয়। সেও উপরিভাগের তাপ। ভিতরের তাপ এরও চেয়ে প্রায় হাজার হাজার গুণ বেশী। আমাদের সূর্য্যের রং হলদে। এর উপরিভাগের তাপ ১২০০০° ডিগ্রিরও বেশী। যে-তারাগুলির আলো দেখতে সাদা, তাপের উপরিভাগের উত্তাপ ৩০০০০° ডিগ্রি হ'তে ৬০০০০° ডিগ্রির মধ্যে। পৃথিবীতে এ পরিমাণ উত্তাপ তৈরী করবার কোন কৌশলই আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নি।

উনুনের উপর জলের হাঁড়ি রাখলে যখন তার জল টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে তখন সেই জলের তাপের মাত্রা থাকে মাত্র ২১২° ডিগ্রি। আর এক একটা তারার উত্তাপের মাত্রা কিনা ৩০০০০° ডিগ্রি হ'তে ৬০০০০° ডিগ্রি।

তারাগুলি এতটা উত্তপ্ত হলেও একমাত্র সূর্য্যের উত্তাপ ভিন্ন অন্য কোন তারার উত্তাপই আমরা অনুভব করিনে। যে-কারণে সূর্য্যকে আমরা বড় দেখি, সে-কারণেই আমরা এর উত্তাপও অনুভব করিনে। সূর্য্য আমাদের নিকটে, তাই এর আলোও আমরা অনুভব করি, একে এতটা বড়ও দেখি।

একটা মোমবাতিকে ছয় মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে কেউ যদি জ্বালিয়ে দেয়, তাহ'লে ছ'মাইল দূর থেকে সে-আলোর উত্তাপ কি আমরা অনুভব করতে পারবো? সূর্য্য ছাড়া অন্য তারাগুলি হ'তে যেটুকু আলো আমাদের পৃথিবীর উপর এসে পড়ে তার পরিমাণ ছ'মাইল দূরবর্ত্তী মোমবাতির আলো হতে একটুও বেশী নয়। তারি জন্য রাত্রিতে আকাশ-ভরা তারা থাকলেও তাদের উত্তাপ আমরা কিছুই অনুভব করিনে। সব চেয়ে যে-তারাটি উত্তপ্ত, সেটিও এত দূরে যে তারও আলোর উত্তাপ ছ'মাইল দূরবর্ত্তী মোমবাতির আলোর উত্তাপের চেয়ে কিছু বেশী নয়। আর সূর্য্য কাছে আছে ব'লে এর একার উত্তাপেই আমরা দিনের বেলা ছটফট্ করি।

কিন্তু আকাশের সব তারাই এতটা উত্তপ্ত নয়। আকাশে এমন অনেক তারা আছে যাদের আলোও নেই, উত্তাপও নেই। তাদের অবস্থা অনেকটা আমাদের পৃথিবীর অবস্থার মতো। তবু পৃথিবী সূর্য্যের কাছ থেকে আলো পেয়ে দিনের বেলায় উত্তপ্ত হয়—তাতে আলোও হয় কিন্তু সে-সব তারা বরফের মত ঠাণ্ডা, অমাবস্যা রাত্রির মত অন্ধকার। কিন্তু এক সময় এসব তারার আলোও ছিল সূর্য্যের মতো, তাদের উত্তাপও যথেষ্ট ছিল। বুড়ো হ'লে মানুষের যেমন শক্তি কমে যায় তেমনি এ তারাগুলি বুড়ো হয়ে গেছে। তাই তাদের শক্তি—আলো ও উত্তাপ দুইই গেছে ফুরিয়ে। সূর্য্যের যে আজ এত তেজ সেও একদিন এমনি বুড়ো হ'য়ে যাবে। তখন তারো এ আলো, এ উত্তাপ কিছুই থাকবে না।

উত্তাপের ন্যায় তারাগুলি হ'তে আমরা যে আলো পাই তাও অতি সামান্য। লক্ষ লক্ষ তারাতেও রাত্রির অন্ধকার দূর হয় না। আর সূর্য্যের একার আলোতেই দিন হ'য়ে যায়।

কেন এমন হয়? তারাগুলির কি আলো নেই? আকাশের এক একটি তারার আলোর তুলনায় সূর্য্যের আলো আর কতটুকু! আকাশে এমন এক একটি তারা আছে যার আলো সূর্য্যের আলোর চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী! কেনোপাস্

নামক তারাটির আলো সূর্য্যের আলোর চেয়ে প্রায় ৮০০০০ গুণ বেশী। এই তারাটি যদি সূর্য্যের মতো আমাদের কাছে থাকতো তাহ'লে তাকে দেখাতো প্রায় চাঁদের মতো। তার আলোতে আমাদের ছায়াও দেখাতে পেতাম।

সাধারণতঃ তারাগুলির দূরত্ব অনুসারে কোনটিকে দেখায় বেশী উজ্জ্বল, কোনটিকে দেখায় কম উজ্জ্বল। আয়তনের উপরও তাদের আলোর তারতম্য অনেকটা নির্ভর করে। আবার অনেক তারার নিজস্ব আলোও কম বেশী আছে।

কোন কোন তারার আলো কখনো কমে আবার কখনো বাড়ে। তারার আলোর এই হ্রাসবৃদ্ধি অবশ্য খালি চোখে দেখা যায় না। দূরবীনের ভিতরে আলোর এই হ্রাসবৃদ্ধি ধরা পড়ে। কোন কোন তারার আলোর এই হ্রাসবৃদ্ধির আবার একটি নিয়ম আছে। আল্‌গল্ ব'লে একটি তারা আছে তার আলো প্রতি দু-দিন অন্তর বাড়ে কমে। প্রাচীন কালে এই জন্য জ্যোতিষীগণ এর নাম দিয়েছিলেন প্রেত নক্ষত্র। তার চার দিকে ঘুরছে আর একটি তারা। কিন্তু তার নিজের আলো নেই। সেই তারাটি ঘুরতে ঘুরতে যখন পৃথিবী ও আল্‌গলের মাঝে আসে তখন আল্‌গলের আলো আমরা দেখতে পাইনে। দু'দিন অন্তর সেই তারাটি যখন আবার স'রে যায় তখন আবার আমরা আল্‌গলের আলো দেখি। অবশ্য দূরবীনের ভিতর দিয়ে। মীরা ব'লে আকাশে আর একটি নক্ষত্র আছে তার আলোর হ্রাসবৃদ্ধি হয় ১১ বৎসর অন্তর একবার ক'রে। সাধারণতঃ খালি চোখে এই তারাটিকে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ১১ বৎসর অন্তর এর আলোর যখন বাড়তি ঘটে তখন একে খালি চোখেও দেখতে পাওয়া যায়। তখন ৩।৪ সপ্তাহ ধরে তারাটিকে খুব উজ্জ্বল দেখায়। তারপর আস্তে আস্তে এর আলো ম্লান হ'য়ে আসে। অবশেষে আর দেখাই যায় না।

তারার আলোর এরূপ হ্রাসবৃদ্ধি কেন ঘটে? এর কারণ এখনো সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কার হয় নি। অনেকে মনে করেন সূর্য্যের গায়ে যেমন কখনো কখনো কলঙ্ক দেখা দেয়, তেমনি তারার গায়েও কলঙ্ক প্রকাশ পায়। সূর্য্যের গায়ের কলঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধির একটি নিয়ম আছে।

আকাশে আর এক শ্রেণীর তারা আছে তাদের বলা হয় নতুন তারা। আকাশের গায় হঠাৎ এরা এক সময়ে জ্বলে ওঠে। কিছুদিন ধরে আকাশের গায় এমনি জ্বলতেই থাকে, তারপর আস্তে আস্তে নিবে যায়। একবার নিবে যাওয়ার পরে তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না।

কেন যে এরূপ হয় এখনো তার কারণ আবিষ্কার হয় নি। কিন্তু অনুমানে এর একটা কারণ আবিষ্কার করা হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ এ তারাগুলির নিজের কোন আলো নেই। কখনো এরা ঘুরতে ঘুরতে অন্য কোন তারার কাছে গিয়ে পড়ে। তখন সেই তারার আকর্ষণে তাদের পিঠের বস্তুরাশি যায় ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে। তখন তার ভিতরের আগুন আসে বের হয়ে। সেই আলো দেখেই আমরা তারাগুলিকে নতুন তারা বলে ভ্রম করি। আবার কেউ কেউ বলেন তারাগুলি ছুটতে ছুটতে কখনো গিয়ে পড়ে কোন একটি উল্কাপিণ্ডের ঝাঁকের মধ্যে। তখন উল্কারাশির ধাক্কায়, ঠোকাঠুকিতে তারাগুলি ওঠে জ্বলে। নতুন তারার আলো দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কখনো দু'এক মাস, কখনো বা দু'চার মাস, খুব বেশী হ'লে ৮।১০ মাস। তারপর সেই যে তারা নিবে যায় আর কখনো তাদের দেখা যায় না।

"অপূর্ব্ব ছবি"

শ্রীমতী রেণুপ্রভা দাম

শুভা গরীবের মেয়ে। সে বড় চমৎকার ছবি আঁকতে পারে। সংসারের নানা খুঁটিনাটি কাজ সেরে যেটুকু সময় পায় বসে ছবি আঁকে। সামান্য একখানা ছবিকে রং ফুটিয়ে সে এমনি সুন্দর ক'রে তুল্‌তো যে দেখলে চোখ জুড়াতো।

শুভাদের ছোট কুটীরের পাশে একটি ফুলভরা যুঁই লতিয়ে উঠেছে। শুভা রোজই সেই ফুল সাজি ভ'রে তুলে এনে মালা গাঁথে।

এক দিন শুভা ফুল তুলতে গিয়ে দেখে চমৎকার এক প্রজাপতি ঘুরে ঘুরে যুঁই ফুলে মধু খাচ্ছে। তেমন বড় প্রজাপতি কখনও সে দেখে নি। তার পাখা দু'টি সোনালী আর রূপালী রংয়ে ঝিক্‌মিক্ ক'রছে—আর তারই মাঝে মাঝে কাজল কালোর ঢেউ খেলানো। শুভা দূর থেকে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখতে লাগলো। দেখে দেখে তার আর মন ভরে না। হঠাৎ এক ঝাপ্‌টা বাতাসে প্রজাপতিকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। শুভার চমক ভাঙলো —তার মনে হলো এতক্ষণ সে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে জাল বুনছিলো। তার আর ফুল তোলা হলো না! সে ঘরে ফিরে গেল।

সাঁঝের বাতিটি ধীরে ধীরে জ্বাললো। তার পরে তার রংয়ের ঝাঁপিটি নিয়ে সুন্দর ক'রে সে আঁকতে লাগলো; সেদিনের মত প্রজাপতি আধ-খানা আঁকা রইলো।

পরের দিন ভোর বেলা শুভা ঘরের কাজকর্ম্ম সেরে আবার রংয়ের ঝাঁপি নিয়ে প্রজাপতি আঁকতে ব'সলো।

সবই আঁকলো শুভা কিন্তু রং আর তেমন ক'রে মিলাতে পারে না। কাজল-কালোর ঢেউগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেল। তখন সে চোখ দুটি বুঁজে একবার কল্পলোকে চ'লে যেতে চেষ্টা ক'রলো। আবার চাইলো, চাইতেই দেখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য— কালকের সেই চমৎকার প্রজাপতিটি তার রংয়ের ঝাঁপির ওপরে চুপটি ক'রে বসে আছে।

প্রজাপতি দেখে তার মন আনন্দে নেচে উঠলো। শুভা তার দিকে চেয়ে চেয়ে তুলিতে রং বুলিয়ে চল্লো। এবার কাজল-কালোর ঢেউ আর সোনালী মিলে ঝিকমিক ক'রে উঠলো। প্রজাপতি চুপটি করে বসেই আছে। কি ভাবছে তা সেই জানে। হয়তো বা শুভার জন্যই সে আছে।

রং বুলাতে বুলাতে দুটি পাখা অপরূপ সাজে সেজে এলো—এখন চোখ আর শুঁড় দুটি রাঙালেই হয়ে যায়। প্রজাপতি ধীরে ধীরে তার জোড়াটির কাছে উড়ে এসে ব'সলো। শুভা তুলি গুটিয়ে নিল। পাখা দুলিয়ে দুলিয়ে প্রজাপতি খানিকক্ষণ কি ভাবলো; গায়ের রেণু তার ঝ'রে পড়লো আঁকা প্রজাপতির গায়ের ওপরে। টুপ ক'রে প্রজাপতি উড়ে গেল। দূরে দূরে, অনেক দূরে। প্রজাপতি আঁকা হয়ে গেলে শুভা ফুলফোটা সেই যুঁই লতাটিও তুলিতে ফুটিয়ে তুললো। ফুলের ওপরে নানান রংয়ের আরো কয়েকটি প্রজাপতি আঁকলো।

ছবিটি শেষ হতে তার সারাদিন কেটে গেল। আপন মনে ছবিটি হাতে নিয়ে শুভা দেখছে, এমন সময় তার বন্ধু স্বপ্না এসে সেখানে হাজির।

স্বপ্না বড়লোকের মেয়ে। শুভাদের বাড়ীর

পাশেই থাকে। শুভাকে তার ভারি ভাল লাগে, তাই দুজনে খুব ভাব।

ছবিটি দেখে স্বপ্না বললে—"বাঃ কি চমৎকার ছবি এঁকেছ শুভা, দেখলে চোখ জুড়ায়! তোমাদের ওই যুঁইলতাটি বুঝি? অমন সব প্রজাপতি পেলে কোথায়?"

তখন শুভা প্রজাপতির সেই ইতিহাস স্বপ্নার কাছে ব'ললে। স্বপ্না শুনে বললে—"এর ভেতরে তো বেশ রহস্য আছে দেখছি। এক কাজ কর, আর দু'দিন বাদেই এখানে খুব বড় একটি চিত্র-প্রদর্শনী হবে, তোমার এই ছবিটি তাতে দিতেই হবে।" শুভা বললে—"হাঁ তাতে কত দেশের কত বড় বড় শিল্পী ছবি দেবেন, আর আমার মত গরীবের মেয়ের এই সামান্য ছবির কি কোন মূল্য হবে?"

স্বপ্না বললে—"মূল্য যিনি বোঝেন, তাঁর কাছে এ ছবি অমূল্য। আমি ব'লে রাখছি, এই ছবির জন্য তুমি প্রথম পুরস্কার পাবে।"

শুভার মুখে বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসি খেলে গেল।

সে ব'লে উঠলো—"সত্যি?"

স্বপ্না বললে—"সত্যি।"

শুভা সেদিনের মত রংয়ের ঝাঁপি উঠিয়ে, ছবি গুটিয়ে সন্ধ্যাবাতি জ্বালিয়ে দিল।

স্বপ্না গল্পসল্প ক'রে বাড়ী চলে গেল।

শুভার ছবিখানা পরদিনই স্বপ্না প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিলো। সেখানে আরো কত রকমের যে সুন্দর সুন্দর ছবি এসেছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

রোজই বহুলোক প্রদর্শনী দেখতে যান।

একদিন হঠাৎ শুভা শুনতে পেলো—একখানা অদ্ভুত ছবি প্রদর্শনীতে এসেছে এবং সেই ছবিখানাই প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

শুভার প্রদর্শনী দেখার ভারি সখ হলো। সে অমনি স্বপ্নার শরণাপন্ন হ'লো। কারণ স্বপ্নাই তাকে নানান জায়গায় নিয়ে যায়।

শুভা ও স্বপ্না প্রদর্শনীতে এলো। তারা ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনীর সব ছবি দেখতে লাগলো। হঠাৎ শুভার নিজের ছবিখানা চোখে প'ড়লো, সে অবাক হয়ে গেল। চোখটা একটু মুছে নিয়ে, শুভা আবার চাইলো। সে দেখলে ছবিতে আঁকা প্রজাপতির কাছে সেই জীবন্ত প্রজাপতিটি পাখা মেলে ব'সে আছে। তারই আশে পাশে আরো নানান্ রংয়ের সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি।

শুভা স্বপ্নাকে সে ছবি দেখালো। স্বপ্না চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"অপূর্ব্ব ছবি! ফুলগুলো গাছে এমনি ভাবেই ফুটে আছে যে প্রজাপতির দলও সত্যি ভেবে ভুল করেছে।"

তাদের পাশ থেকে ছবি-রক্ষক একটি মেয়ে ব'লে উঠলো—"এই প্রজাপতির দল রোজই এখানে এমনি ক'রে এসে বসে। এইটিই ছবির বিশেষত্ব এবং এই ছবিটিই প্রদর্শনীর প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। উত্তর দেশের এক মহারাজা ছবিটি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে দশ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিতে চেয়েছেন। সেই মহারাজা আজ এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত আছেন।"

স্বপ্না সেকথা শুনে শুভার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে সেই মহারাজার কাছে গিয়ে হাজির হলো।

মহারাজাকে অভিবাদন ক'রে স্বপ্না বললে—"মহারাজ, আপনি যে ছবি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে দশ হাজার টাকায় কিনে নিতে চেয়েছেন, এই সেই ছবির শিল্পী শ্রীমতী শুভারাণী। আপনি জানবেন আপনার এই মহৎ দান সার্থক ও সফল হবে।"

মহারাজা স্তম্ভিত হ'য়ে শুভার করুণ মুখের পানে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ প্রদর্শনী বন্ধ হবার ঘণ্টা বেজে উঠলো।

হাসির দেশের মেয়ে

ভোরের থেকে সব কাজই উল্‌টো হয়ে যাচ্ছে! কি যে মুস্কিল! রেণু এমন বিরক্ত হয়ে উঠলো! সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বার হবার সময়ে বিড়ালটার লেজ চাপা দেওয়াতে সে রেগে তার পায়ে আঁচড়ে দিল। সে যায়গায় তাড়াতাড়ি আইওডিন লাগাতে গিয়ে আইওডিনের শিশিটা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। সকালে খাবার ইত্যাদি খেতে যেতে দেরী হয়ে গেল। খাবার ঘরে গিয়ে দেখে তার দুধটা জুড়িয়ে গেছে, রুটিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে ভারি বিরক্ত হলো!

সে ভেবেছিল আজ ছুটির দিনে মাসিমার বাড়ী যাবে, সেখানে গিয়ে মাসতুত ভাই-বোনদের সঙ্গে গল্প করবে, খেলা করবে। কিন্তু তখনি মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। কি যে গোলমাল সকাল থেকে সুরু হয়েছে।

সে তখন চেঁচিয়ে বলে উঠলো—আজকে যে কি খারাপ দিন! সবই গোলমাল!

তার ঠাকুরদাদা নাতনির খেদোক্তি শুনে বললেন—কি রে রেণু, হয়েছে কি? এত বিরক্ত কেন? আয় আমার কাছে, আমি বলে দিচ্ছি, কেমন করে সব গোলমাল ঠিক করতে হয়।

রেণু তখন ঠাকুর্দ্দার কোলের কাছে এসে বলল—কেমন করে ঠাকুর্দ্দা!

ঠাকুর্দ্দা বললেন—হাসিখুসি আর আলোর দেশের মেয়ে হ'।

রেণু বলল—কেমন ক'রে হবো?

ঠাকুর্দ্দা বললেন—বৃষ্টিবাদল হলেও তা হলে মন খারাপ হবে না।

রেণু বলল—আচ্ছা আমি হাসি ও আলোর দেশের মেয়েই হবো।

ঠাকুর্দ্দা—আচ্ছা বেশ, খুব খুসী হলাম। প্রথমে সে দেশের নিয়মগুলি জেনে নে। তোর শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে আয় ত?

রেণু তার শ্লেট পেন্সিল নিয়ে এলো। ঠাকুর্দ্দা তাকে লিখতে বললেন—যখন দিন খারাপ যাবে তখনও হাসবে আর একটা ভাল সান্ত্বনার উপায় বার করবে।

এই কথা লিখে রেণু হাসছিলো। তার ঠাকুর্দ্দার কাছে থাকলে কেহই মুখ ভার করে থাকতে পারে না।

রেণু বললো,—আমি মাসিমার বাড়ী যেতে পারব না, লীলাদিদিদের সাথে খেলাও করতে পারব না কিন্তু আমি একটা কাজ করতে পারি। পিসিমার জন্মদিনে নিজের হাতে করে তাঁকে একটা উপহার দিতে চাই সেটা এখনই আরম্ভ করতে পারি। আর সেটা তুমি তাঁকে দিয়ে আসতে পারবে—তুমি ত তাঁকে দেখতে যাচ্ছ?

ঠাকুর্দ্দা বলেন—হাঁ, বেশ এই কাজটাই কর।

রেণু বলল—ঠাকুর্দ্দা, আমি যদি এই ক'টি ভাল কথা মোটা ড্রয়িং কাগজে বেশ সুন্দর করে রং দিয়ে মটোর মত করে লিখি তাঁর খুব ভাল লাগবে না? কোন্ কথাগুলি লিখব শুনবে?

"অভয় মনে, হাস্য মুখে চলব সকল দুঃখে, সুখে
তোমার নামটি লয়ে বুকে, গেয়ে যাব প্রেমেরই
জয়।

ঠাকুর্দ্দা, এ কথাগুলি বেশ সুন্দর না!

ঠাকুর্দ্দা বললেন—হাঁ, তাঁর খুবই ভাল লাগবে। আর তুমি মটোটা লিখলে আমি সেটা বাঁধিয়ে দেব।

সেই থেকে রেণুর যখনি বিরক্ত ধরতো তখনই মটোর কথাগুলি মনে করতো। তার মা বাবা তার স্বভাবের পরিবর্ত্তনে খুবই খুসী হলেন। তার দাদাও তাকে ডাকতে লাগলো "হাসি" বলে।

মৈথিলী মিলন

(রাম ও সীতার সাক্ষাৎ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার

প্রথম দৃশ্য

[উষাকালে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে একদল বনদেবী বাল্মীকির তপোবন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তপোবনের অবস্থা দেখিয়া বনদেবীদিগের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইল]

বনদেবীগণ—

শূন্য তপোস্থল,
নাহি হোমানল।
নাহি সামগীতি,
প্রাতঃস্তব-স্তুতি
শূন্য তপোবন—
কোথা তপোধন ?

বনদেবীগণের নেত্রী।—(তপোবন-নিবাসিনী বনদেবীর প্রতি)—সখি, আজ কেন তপোবনে হোমাগ্নির ধূম উত্থিত হইতেছে না ? আজ কেন তপোবন সামগানে নিনাদিত হইতেছে না ? আজ কেন পূজার্চ্চনায় তপোবন-পুষ্প এখনও অনবচিত ? মহর্ষির ত কুশল ?

তপোবন-নিবাসিনী-বনদেবী।—হায় প্রিয় সখি, দুঃখের কথা আর কি বলব ? সীতা দেবীর মঙ্গল-কামনায় কিছু দিন হইল মহর্ষি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। আশ্রমের ভার তাঁহার সহবাসী শিষ্য সাঙ্গ রবের হস্তে সমর্পিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি পীড়ায় শয্যাশায়ী! আশ্রমের সঞ্চিত খাদ্যও ইতিমধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সীতা দেবী ও তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয়ের দিন এক রকম অনশনেই কাটিতেছে। এ দৃশ্যে সখি!—কি ছার আমার কথা—পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

প্রথম বনদেবী।—আহা, কি শোচনীয় অবস্থা। আমরা বনদেবী—কি কিছু করিতে পারি না ?

দ্বিতীয় বনদেবী।—হাঁ, প্রিয় সখি—আমরা বনদেবী, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া থাকি। আশ্রমের জন্য বন্য ফলমূল আহরণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু এক্ষণে শীত ঋতু। কদাপি বৃক্ষে ফল দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষির তপোবনেই আমার নিবাস—আশ্রমের দৈন্য কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারিলে আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হইব।

(দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতে করিতে বনদেবীগণের প্রস্থান)

লবকুশ মিলি বনে খুঁজে ফলমূল,
গৃহকোণে ব'সে সীতা মহাচিন্তাকুল
দরদর ধারে অশ্রু ঝরে নেত্র হ'তে,
অসময়ে সখা হায়! কেহ না জগতে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[লবকুশ ফলমূলের অন্বেষণে অরণ্যে গিয়াছে। একাকিনী তমসার কূলে বসিয়া উৎকণ্ঠিতা সীতা দেবী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বিলাপ করিতেছেন]

সীতা।—"আশ্রমের খাদ্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সাঙ্গ রবও পীড়িত। কে খাদ্যাহরণে বহির্গত হইবে ? আমার উদরে অন্ন নাই কিন্তু আমার বাছাদের দশা ভাবিয়াই আমি পাগল হইবার

উপক্রম হইয়াছি। হা ভগবান! আমি ইক্ষ্বাকু-কুলের মহিষী কিন্তু আমার মত হতভাগিনী জগতে কে আছে? যিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর, তাঁহার মহিষী আজ কিনা এক মুঠা অন্ন হইতেও বঞ্চিত!

আর্য্যপুত্র! তুমি কি স্বপ্নেও একবার আমার দুর্দ্দশা ও দৈন্য দেখিতে পাও না? অতিকষ্টে সংগ্রহ বন-ঘাসের বীচি দ্বারা রুটি তৈয়ারী করিয়া আমার বাছাদের মুখে দিতেছি। ভগবান্, তুমিই দীনহীন জনের একমাত্র বন্ধু—তুমিই আমার বাছাদের রক্ষা কর—রক্ষা কর।

সীতা দেবীর চক্ষু হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। চীৎকার করিয়া লব-কুশকে ডাকিতে লাগিলেন!—

কোথা বাছা লবকুশ? আয়
মার কোলে!
বৃথা ফল-আশে ভ্রমিস্
রে বনস্থলে।

তৃতীয় দৃশ্য

[সহসা মৃদু পদধ্বনি সীতা দেবীর কর্ণগোচর হইল। তিনি চমকিয়া শব্দাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন—কুশ আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে]

[কুশ দৌড়িয়া আসিয়া সীতাকে জড়াইয়া ধরিল]

কুশ।—'মা'

সীতা।—কি বাবা! তোমার মুখ এত প্রফুল্ল কেন?

কুশ।—ওই যে পাহাড়টা দেখছ, ওইখানে ফল না পেয়ে আমি একটি ক্ষুদ্র রাখাল বালকের কাছে বসেছিলাম। তার কি কষ্ট মা! আমার তাকে দেখে দুঃখ হলো।

সীতা।—তোমার বড্ড দুঃখ হলো? কেন বাবা?

কুশ।—সে মেষ চরাতে চরাতে কাঁদছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ভাই কাঁদছো? সে বলল—ক্ষুধার জ্বালায়! সারাদিনে এক টুকরাও রুটি আমার ওষ্ঠাগত হয় নি। আমি ক্ষুধায় ছটফট করছি।

আমি বললাম—কেঁদ না ভাই। আমার কাছে কিছু খাবার আছে। তুমি, মা, আমাকে যে রুটিটা দিয়েছিলে সেটা আমি তাকেই দিলাম। আমারও ক্ষিদে পেয়েছিল, কিন্তু সে কি আগ্রহে রুটিটা খেতে লাগলো। দেখে আমার বড় আনন্দ হলো।

সীতা (কুশকে আদর করিয়া)—তুমি মায়ের সুসন্তান। ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

কুশ।—আমিও যদি ওরই মতন ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদতাম, বেচারাও আমাকে তার রুটিটা দিত। মা, তুমি রাগ করছো না ত?

সীতা।—রাগ করবো কেন বাছা! তুমি ভাল কাজই করেছ। কিন্তু জান কি ঘরে কিছুমাত্র খাদ্য নাই। ওই শেষ রুটিটা তোমায় দিয়েছিলাম।

কুশ।—জানি মা, কিন্তু রুটিটা দিয়ে আমার কি আহ্লাদ হলো। তুমিই বল মা, "পরের যে ভাল করে, ভগবান তার ভাল করেন!"

সীতা (কুশকে আলিঙ্গন করিয়া)—"ইক্ষ্বাকু-কুলের এই তো ধর্ম্ম।"

কুশ।—মা, তুমি কাঁদছো?

সীতা।—বাছা, ওই পাহাড়ের উপরে চড়ে দেখ, তোমার দাদাকে কোথাও দেখতে পাও কিনা। অনেক ক্ষণ হলো ফল খুঁজ্‌তে গেছে। দেরী করো না।

কুশ।—আচ্ছা মা, এক্ষুনিই যাচ্ছি।

(কুশের প্রস্থান)

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

লিজি

(রোমীয় উপন্যাস—দ্বিতীয় ভাগ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আন্টিয়াম সহরে নীরোর সভাসদগণের মধ্যে পেত্রোনেরই প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল, সেখানে টিগেলিনের কোন প্রাধান্য রহিল না। রাজসভায় প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল নীরোর রচিত সঙ্গীত কিম্বা নীরোর পঠিত কবিতার সমালোচনা হইল। পেত্রোন সুরসিক ও বাগ্মী, অন্যান্য সভাসদ অপেক্ষা বহু গুণে শিক্ষিত। কাজেই তাহারই জয় হইল। তাহারই প্রাধান্য বাড়িতে লাগিল। সম্রাটও পেত্রোনের সংসর্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। নীরো পেত্রোনের মতামত জানিতে চাহিতেন, তাহার উপদেশ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাহার প্রতি কতকটা সরল বন্ধুভাবও প্রকাশ করিতেন।

পেত্রোন চিরাভ্যস্ত প্রকৃতিগত সন্দেহবাদের ফলে সম্রাটের অনুগ্রহে ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। তিনি পূর্ব্বের মতই সুরসিক ও বিচক্ষণ রহিলেন, কখনো কখনো পেত্রোন নিজেকে, সভাসদগণকে, এমন কি সমগ্র বিশ্বজগতকেও যেন উপহাস করিতে ভীত হইতেন না। পেত্রোনের মন্তব্য শুনিয়া নীরো ভ্রুকুঞ্চিত করিলে লোকে পেত্রোনের নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়া উৎকণ্ঠিত হইত। তখন তিনি ধীরভাবে তাহার সমালোচনা এমন শ্রুতিমধুর করিয়া তুলিতেন যে সম্রাট নীরো সমালোচনায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া পেত্রোনের আরও বেশী আদর করিতেন।

একদিন রাজসভায় নীরো রমণীদিগকে স্বরচিত কবিতার এক অংশ পড়িয়া শুনাইলেন। পাঠ শেষে সকলেই একস্বরে কবিতার প্রশংসা করিল। পেত্রোনের দিকে চাহিয়া নীরো পেত্রোনের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন।

পেত্রোন বলিল—"কবিতাটি পোড়াইয়া ফেলুন, উহা ভাল হয় নাই।"

উপস্থিত সভাসদগণ ভয়ে আড়ষ্ট হইল। তাহারা ভাবিল এবার পেত্রোনের আর রক্ষা নাই। সম্রাটের গর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছে। তিনি এ অপমান কখনও মার্জ্জনা করিবেন না। টিগেলিনের মুখ উজ্জ্বল, ভিনিসিয়াসের মুখ বিবর্ণ হইল। ভিনিসিয়াস ভাবিল আজ পেত্রোনের মাথার গোলমাল হইয়াছে।

আত্মগর্ব্বে আঘাত পাইয়া নীরো মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কবিতার দোষ কি?"

পেত্রোন রমণীদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন—"উহাদের প্রশংসা শুনিবেন না। উহারা কবিতার কিছুই শুনে নাই। কবিতাটী কেন আমি ভাল বলি না আপনি তাহা জানিতে চাহেন? বেশ, আমি সত্য কথাই বলিতেছি। যদি ওভিড কিম্বা ভার্জ্জিলের লেখনী হইতে এই কবিতা বাহির হইত তবে ইহা উৎকৃষ্ট বলিতাম। কিন্তু নীরোর হাতের এ কবিতা অমার্জ্জনীয়। এরূপ কবিতা লিখিতে আপনার অধিকার নাই। আপনার বর্ণিত অগ্নিকাণ্ডে উজ্জ্বলতার অভাব। যদি কবি লুকান এই কবিতা লিখিত, তবে তাহাকে প্রতিভা সম্পন্ন মনে করিতাম। আপনার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। আপনি শ্রেষ্ঠ কবি।

যিনি দেবতার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সকলেই শ্রেষ্ঠ ফল দাবী করেন। নিশ্চয়ই অলসতা প্রযুক্ত আপনার অযোগ্য কবিতা লিখিয়াছেন। আপনি শ্রেষ্ঠ কাব্য লিখিতে সমর্থ, কাজেই আপনাকে স্পষ্ট কথায় বলিতেছি "কবিতাগুলির আরো উন্নতি করুন।"

এই কথাগুলি অতি নিস্বার্থভাবে, কখনও প্রশংসা, কখনও বিদ্রুপ করিয়া পেত্রোন নীরোকে বলিলেন। ইহা শুনিয়া গর্ব্বে ও আনন্দে নীরোর চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তিনি বলিলেন—"দেবগণ আমাকে ক্ষুদ্র শক্তি দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অনুগ্রহেই এমন দুর্লভ বিচক্ষণ সমালোচক ও প্রকৃত বন্ধু পাইয়াছি।"

ইহা বলিয়া সম্রাট স্বর্ণ পাত্রে রক্ষিত অগ্নির দিকে হাত বাড়াইয়া কবিতাগুলি পোড়াইতে সংকেত করিলেন।

কাগজে আগুন ধরিবার পূর্ব্বেই পেত্রোন উহা হাতে লইয়া বলিলেন—"দেব, কবিতাগুলি আমাকে দান করুন। আপনার প্রতিভার অযোগ্য হইলেও এই কবিতাগুলি মানবজাতির মূল্যবান সম্পত্তি।"

তখন আনন্দে অধীর হইয়া সম্রাট পেত্রোনকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বলিলেন—পেত্রোন তোমার কথাই সত্য, বাস্তবিকই আমার বর্ণিত "ট্রয়" অনুজ্জ্বল অগ্নিতে পুড়িতেছে। আমার বর্ণনা কেন পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পার। ভাস্কর আদর্শ দেখিয়া মূর্ত্তি গঠন করে, আমার সম্মুখে কোন আদর্শই নাই। আমি কখনও কোন নগর ভস্মীভূত হইতে দেখি নাই।

সকলেই এবার নীরব হইল। একটু পরে টিগেলিন বলিল—"প্রভু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদেশ করুন আন্টিয়াম সহরে এখনি আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। যদি এখানকার রাজপ্রাসাদ এবং ভিলাগুলি মূল্যবান মনে করেন, তবে আমি অষ্টি বন্দরের জাহাজগুলিতেও আগুন দিতে পারি। এমন কি আলবানি পর্ব্বতের শীর্ষদেশে এক কাষ্ঠময় কৃত্রিম সহর নির্ম্মাণ করাইতে পারি। আপনি স্বহস্তে তাহাতে আগুণ দিতে পারিবেন। আমি কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষা করিতেছি।"

নীরো অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কই তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। কাঠের খাঁচা পুড়িতে দেখিলে শিল্প-কলা হিসাবে আমার কি লাভ হইবে? ইহাতে প্রমাণ হয় যে আমার প্রতিভা সম্বন্ধে তোমার ধারণা কত ক্ষুদ্র।" নীরোর উত্তর শুনিয়া টিগেলিনের মুখ বিবর্ণ হইল। নীরো তখন অন্য কথা বলিতে লাগিলেন।

এ ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মে রোম নগরে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অথচ গ্রীষ্মকালে সার্কাসের খেলা দেখিতে রোমে যাওয়া প্রয়োজন। তখন টিগেলিন সম্রাটের কাছে গিয়া মৃদু স্বরে বলিল—প্রভু, সকলে চলিয়া গেলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একটা গোপনীয় কথা শুনিবেন।"

ক্রমশঃ

নীতি বিদ্যালয়ের স্মরণে*

প্রাক্তনছাত্র শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে পড়ে আজ অতীতের কত
স্মৃতিমাখা সব কথা,—
কত দৈন্য, দুর্দ্দশা নিয়ে
এসেছিনু আমি হেথা।

পুণ্য স্মৃতির উজল শিখা
জ্বলিতেছে আজ প্রাণে ;
কত আদর্শ পেয়েছিনু হেথা
কত কি নীতির গানে।

কত ভক্তি, কত সত্য,
কত কি ত্যাগের কথায়
কত জীবন্ত চরিত-বাণী
শুনেছিনু আমি হেথায়।

সেই মনে পড়ে, ক্ষুদ্র শিশুর (থিওডর পার্কার)
বিবেক বাণীর কথা ;
বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদের
কত কি জীবন গাথা।

বীর সন্তান কেশবচন্দ্র,
রামমোহনের কীর্ত্তি,
ব্রহ্ম পূজারী মহান্-ঋষির
পুণ্য জীবন বৃত্তি।

"ভেঙ্গে ফেল আজ মোহকারাগার,
জাগরে মানুষ ভাই ;
দূর কর আজ হিংসার ভার,
নবীন পরাণ চাই।

জগতেরে আজ বাসিতে ভাল,
মুক্ত করহ প্রাণ,
বিশ্বের যিনি রাজার রাজা,
গাওরে তাঁহার গান।"

মানুষ গড়ার এই সব বাণী,
কর্ণে বাজিছে আজ ;
জীবনেও তাহা ভুলিবনা কভু,
রাখিব হৃদয় মাঝ।

বারে বারে আজ জাগিতেছে বুকে
সেই সে বীরের স্মৃতি,
সাধনায় যাঁর গড়েছিলো এই
প্রতিষ্ঠানের নীতি।

ভাবিবার কাল আসিয়াছে আজ,
দেখিতে হইবে ভাবি ;
কাজটি কি মোরা করিতেছি আজ
রাখিয়া পূর্ণ দাবী ?

কিন্তু হায় রে ! ধীরে ধীরে আজ
ক্ষয়িতেছে এর প্রাণ,
একদিন হায় ! গেয়েছিলো ওগো
মানুষ গড়ার গান !

বাঁচাবার তরে এটিকে ওগো !
নাহিকি কাহার প্রাণ ?
জাগাবার তরে সে জীবন ওগো !
গাইবে না কেউ গান ?

পরাণ থাকিতে দিবে না মরিতে,
এস এস আজি ভাই !
পুণ্য এ স্মৃতি রাখিতে হইবে,—
জাগো জাগো সবে ভাই।

পরাণ থাকিতে দিবে না মরিতে,
এস এস আজি ভাই !

---

* কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের বার্ষিক (মাঘ, ১৩৪৮) উৎসবে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

আরবদের তাঁবুতে

আরব দেশের লোকদের কি তোমরা দেখেছ? এরাবরা মরুভূমিতে বাস করে। তারা আরব দেশের মরুভূমিতে বাস করে।

যারা আসল এরাব তারা তাঁবুতে বাস করে। তাঁবুর ছাদটা কাল পরদা দিয়ে তৈরী। পরদাটা ছাগলের লোম দিয়ে তৈরী। এরাবরা ছাগলের পাল পোষে এবং তাদের লম্বা চুল দিয়ে তাঁবুর কাপড় তৈরী করে।

তাঁবুর অর্দ্ধেকটা খোলা থাকে। এই খোলা যায়গাতে পুরুষরা বাস করে। আর অর্দ্ধেকটা পরদা দিয়ে ঢাকা থাকে সেখানে স্ত্রীলোকরা বাস করে। সে যায়গায় কোন পুরুষের যাবার হুকুম নাই।

যে এরাবরা মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এক যায়গায় বাস করে না তাদের বেদুইন বলে। তাদের পোষাক সহরের এরাবদের চেয়ে অন্য রকম।

বেদুইনরা একটা লম্বা সাদা সার্ট পরে, সেটা প্রায় পা অবধি পৌঁছায় আর তার হাতা বেশ ঢিলা। কোমরে চামড়ার বেল্ট। তাদের জামায় কোন পকেট থাকে না কাজেই বেল্টটা কাজে লাগে। বেল্টের সঙ্গে একটা ছুরি ও লম্বা বাঁকানো তরোয়াল থাকে। টাকা পয়সা একটা ছোট থলেতে রাখে,—সে থলেটা বেল্টের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

তারা সার্টের উপর একটা কালো ক্লোক পরে, সেটাকে আব্বা বলে। এটারও বেশ চওড়া হাতা। জন্তুর চুল দিয়ে এই ক্লোক তৈরী হয়। এরা মাথায় একটা চৌকণা সাদা কাপড় বাঁধে তাকে বার্ণাস বলে – এটাও পশম অথবা ছাগলের চুলের দড়ি দিয়ে মাথায় বাঁধা থাকে। মাথায় সাদা কাপড় বাঁধাতে রৌদ্র কম লাগে।

মরুভূমির এরাবরা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। বন্দুক সঙ্গে না থাকলে তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করে না।

আরব দেশের স্ত্রীলোকদের পোষাকও প্রায় ওই রকমই তবে তারা মাথা থেকে পা অবধি একটা লম্বা পোষাক দিয়ে ঢাকে। সে লম্বা পোষাকটা সাধারণতঃ কালো রঙের আর উৎসবের দিনে লাল রঙের হয়। এরাবরা কফি পান করতে খুব ভালবাসে। দলের মধ্যে যে প্রধান সে আগে কফি পান করে। তারা নীরবে কফি পান করে, একটুও হাসে না পর্য্যন্ত। কখন কখন বা দলপতি সে সময়ে কথা বলেন। এক দলপতি ডাকলেন—জেরিও!

তৎক্ষণাৎ একটি ছোট ছেলে এসে বল্লে—বাবা, কেন ডাকছেন? তার হাতে একটা লম্বা সরু চামড়া বুটের ফিতার মত। সেটার মুখে গিঁট আছে। আর এক হাতে একটা লাঠি।

জেরিও ছাগল চরাচ্ছিল। দলপতি জিজ্ঞাসা করেন—সব ঠিক মত আছে ত?

জেরিও উত্তর দেয়—হাঁ সব ঠিক। পাহারাওয়ালা কুকুরের চোখে ঘুম নাই।

তখন দলপতি খুসী হয়ে বলেন—আচ্ছা, খুব ভাল।

তারপরে তিনি হাত নাড়েন আর সে চলে যায়। আর লোকেরা কফি পান করতে থাকে। তারা তখনও কথাও বলে না, হাসে না।

কিছুক্ষণ পরে অন্য একজন এরাব আসে। সে অপরিচিত। সে আগুণের ঠিক কাছে আসে নাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে খুব ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত্ত—রাত্রির জন্য বিশ্রাম ও আশ্রয় চায়। সে শত্রুপক্ষের লোক নয় কাজেই সে জানে তার কোন বিপদ নাই।

অপরিচিত লোক জিজ্ঞাসা করে—ভাই, তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া নাই ত?

দলপতি বলে—না।

তখন অন্যরা একটু সরে বসে তাকে যায়গা দেয় ও কফি ও খেজুর খেতে দেয়।

এরাবরা অতিথিকে খুব আদর যত্ন করে তবে সে যদি শত্রুপক্ষের লোক না হয়। একবার যদি অতিথি খাদ্য গ্রহণ করে তবে সে নিরাপদ। সে দলের কেহই তার কোন ক্ষতি করবে না। সকলে বলে—সে যে নূণ খেয়েছে।"

হঠাৎ হয়ত একজন এরাব মরুভূমির দিকে দেখিয়ে বলে—দেখ, দেখ, একজন পলাতক।

আর একজন এরাব বলে—ও যে আমাদের দলের দেখছি।

তৃতীয় জন বলে—ঠিক হাকিমের ছেলে ইনের মত দৌড়াচ্ছে।

আর একজন বলে—তার উটটা গেল কোথায়?

সকলে চুপ করে বসে থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পলাতক তাদের কাছে না আসে।

অত দৌড়াবার ফলে সে হাঁপাতে থাকে কতক্ষণ কথা বলতে পারে না। সকলে চুপ করে অপেক্ষা করে।

পলাতক আগুণের কাছে বসে বলে, নমস্কার।

দলপতি বলেন—আশীর্ব্বাদ করি।

পলাতক বলে—খবর আছে। আমি যখন উটের দলের রক্ষণাবেক্ষণ করছিলাম তখন আমি তিনজন লোক দেখতে পেলাম। তারা দূরে ছিল, তবুও তাদের চিনতে পেরেছি। তারা সির্দ্দি জাত। নিশ্চয়ই তাদের দলে আরও লোক আছে তারা সকালের জন্য অপেক্ষা করছে। সকাল হলেই উটের দলকে নিয়ে তারা পালাবে। আমার ভাই আনিকে পাহারা রেখে এসেছি। আমি উটে চড়ে আসছিলাম কিন্তু উটটা পড়ে গিয়ে পা মুচকে ফেলেছে সে জন্য আমি দৌড় দিলাম। লোকরা এখনও ৩০ মাইল দূরে আছে।

আগুণের চারিদিকে লোকরা বসে আগুণ পোহাচ্ছিল, এ কথা শুনে কতক্ষণ তারা চুপ করে রইলো। সকলেই দলপতির মুখের দিকে চেয়ে—তিনি কি আদেশ করেন।

দলপতি বললেন—ভাল খবর, আচ্ছা ওকে খেতে দাও। লোকদের সব ডাক—প্রত্যেকেই যেন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসে। ঘোড়া সাজাও। সেই উটের দলকে নিয়ে এসো—আর দশজন লোক উটগুলির পাহারায় নিযুক্ত থাক। আজ রাত্রেই সেই লোকদের পিছু আমরা নেব—ভাল শীকার যেন হয়।

দলপতির আদেশ শুনেই সকলে উঠে দাঁড়াল তারপরে বাইরে চলে গেল। সব শেষে দলপতি গেল।

বেলি সাখরের তাঁবুতে একদিন যে ঘটনা ঘটেছিল তাহা লেখা হলো।

মুকুল সাহিত্য সঙ্ঘ

কোথায় বাদ্‌লা দিনে থাক্‌বো

কৌমার বসন্তকুমার বর্মাসরকার

আমি একদিন একাটি বসে রয়েছি—বা'রের ঘরের বারান্দায়—ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময়ে আমাদের ক্ষেতের কিষাণ সব দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলো—ভিজা কাপড়ে। আকাশে ঝিলিক দিলে। ত্রস্ত কণ্ঠে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "বলতো বসন্ বাবু, আকাশের বিদ্যুৎ মাটিতে পড়লে মানুষ কেন মারা পড়ে?" উত্তর কিছু দেবো, তখনো ওরূপ বুদ্ধিবৃত্তি আমার হয়নি। বেশ মনে ছিলো ঐ কথা তাই বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যখন বইয়ে পড়া গেল তখনি সমাধান হ'ল বাল্যকালের ঐ কুটিল প্রশ্ন।

সকলে আমরা জানি বিদ্যুতের দ্বারা কেমন ক'রে এক দেশের খবর অন্য দেশে পাঠানো যায়; আর কিরূপেই বা সহর নগরকে আলোকিত করে' রাখা যায়। বিদ্যুতের আধার "সেল" দু'টী বিভিন্ন ধাতব পাত দিয়ে একটী তার দ্বারা যুক্ত করে দিলে বিদ্যুৎ চলতে থাকে। তামা প্লাটিনাম প্রভৃতি ধাতু তড়িৎ পরিবাহী; আর কাঠ, রবার, কটন্ প্রভৃতি বিদ্যুত—অপরিবাহী। পৃথিবীও কিন্তু বিদ্যুৎ—সুপরিবাহী। টেলিগ্রাফ অফিসের সেলের একটী তার মাটিতে সেট্ করা থাকে। মাটির ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে—তাইতো টেলিগ্রাফের পরিশ্রম অনেক কমে গিয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীরা বিদ্যুতের লাইনের কাজ করে—অপরিবাহী কাঠের ষ্টুলের ওপর বা মইএর ওপর দাঁড়িয়ে। কারণ মানব দেহ এমন কি প্রত্যেক প্রাণীর দেহের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ স্বচ্ছন্দে চল্‌তে পারে। প্রাণীর প্রাণ আছে—বিদ্যুতের ক্রিয়ায় প্রাণ টেঁকে না। মানুষের দেহের মাংস সঙ্কুচিত হয়—গাছের দেহে ঐরূপ ক্রিয়া দর্শে।

আকাশে বাদলা দিনে যে বিদ্যুৎ ঝিলিক দেয়—উহারও শক্তি কোন ক্রমে কম না। বর্ষা কালে ভয় হয় কোথায় বজ্র পড়বে। উহা জীব জন্তু, গাছপালা নষ্ট করে। উহা যখন পড়ে তখন মাটিতে বিদ্যুৎ চলে, নিকটস্থ মানুষ পর্য্যন্ত চৈতন্য-হীন হয়—বহুবার এরূপ দেখা গেছে। কাজেই আমি আমার প্রত্যেক ভাই ভগিনীকে বলে দিচ্ছি তারা যেন বর্ষাকালে চৌকির ওপর বা অন্য কোন প্রকার কাঠে তৈরী জিনিসের ওপর দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। নিকটে কোথাও বজ্রপাত হলে যতটা দূর পর্য্যন্ত মানব দেহে ইলেক্‌ট্রিক কাজ করতে পারে তত দূরে কোন কাঠের ওপর থাক্‌লে উহার ক্রিয়া হতেই পারবে না—তবে একেবারে নিকটে আর মাথার ওপর পড়লে তো লোকে দায়ী না। বাঁশের দ্বারা তারা যারা গরীব স্বল্প ব্যয়ে রক্ষা পেতে পারে।

তা' হলে বোঝা গেল, বাদলা দিনে মাটিতে সংলগ্ন থাকা আমাদের উচিত নয়। স্কুলের প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর কর্ত্তব্য নিজ নিজ আলয়ের পাশের অজ্ঞ লোকদিগকে সাবধান করে দেওয়া আমার মতে। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে উপসংহারে বিনয় করে বোল্‌ছি তারা যেন এইরূপ ভাবে অনেক কিছু আবিষ্কার করে দেশের অজ্ঞ লোককে অনর্থের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে। জ্ঞান চয়নের জন্যে বিদ্যালয়ে আমরা এসেছি; পুঁথিগত সূত্র সব সাংসারিক বা ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাব না—শুধু বুলি মুখস্থ করে' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নেব এরূপ যেন মনে না করেন আমার প্রিয় ভাই ভগিনী সব, কেমন?

আবিষ্কারের কথা

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময় চিনির অভাব হয়েছিল তখন অনেক যায়গায় চিনির বদলে স্যাকেরিন ব্যবহার করা হ'ত।

আমেরিকায় একজন বৈজ্ঞানিক আলকাৎরা নিয়ে গবেষণা করতে করতে হঠাৎ এই মধুর চেয়ে মিঠা জিনিষের সন্ধান পান।

বৈজ্ঞানিক রেমসেল আলকাৎরা নিয়ে গবেষণা করছিলেন এমন সময় তাঁর খুব ক্ষুধা পেলো। তিনি তাড়াতাড়ি এক হোটেলে এসে খেতে বসলেন। খেতে আরম্ভ করতেই দেখেন, খাবার ভয়ানক মিষ্টি লাগছে। এত মিষ্টি যে মুখে দেওয়া যায় না। যে খাবারই খেতে যান, সেই রকমই মিষ্টি লাগে। এদিকে ক্ষিধে পেয়েছে আর রান্নার এমন গোলমাল দেখে, রেগে তিনি হোটেল কর্ত্তাকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে খুব বকুনী দিতে লাগলেন।

তিনি ত হতভম্ব। এত মিষ্টি ত কোন কিছুতেই দেওয়া হয় নাই। আর রুটিই বা মিষ্টি লাগবে কেন, তাতে তো চিনি একটুও দেওয়া হয় নাই।

সেদিন আর তাঁর খাওয়া হলো না। রেগে জল খেয়ে উঠবার সময় হাতের আঙ্গুল মুখে লাগায় আঙ্গুলটা মিঠা লাগলো। ব্যাপারখানা কি? আঙ্গুল চুষে দেখেন, সত্যই তো আঙ্গুলে এত মিঠা এলো কোথা থেকে? ভাল করে হাত ধুলেন, কিন্তু তখনও মিষ্টতা যায় না।

হঠাৎ তাঁর কি কথা মনে হলো। তক্ষুণি ছুটে তিনি ল্যাবরেটারীতে এলেন। যে সব জিনিষ নিয়ে কাজ করছিলেন প্রত্যেকটি খুব ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে স্যাকারিনের অস্তিত্বের খবর পেলেন।

বিচিত্র সংবাদ

সম্প্রতি ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব্বে কোন এক সহরে শত্রু বোমা বর্ষণ করে। তখন জনি ব্রাউন নামে এক ১৪ বছরের ছেলে শুনতে পেলো যে, যে বাড়ীতে তার দিদি থাকেন সেই বাড়ীর কাছেই বোমা পড়েছে। সে তখনি সেই দিকে ছুটলে—দিদি নিরাপদে আছেন কিনা দেখবার জন্য। সেখানে পৌঁছে দেখে কতগুলি বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। সে উদ্ধারকারীদের সঙ্গে কাজে লেগে গেলো। ১৩ ঘণ্টার পর দেখা গেল তখনও সেই বালক ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীগুলি থেকে ভাঙ্গা চুরমার জিনিষপত্র সরাচ্ছে। কি অধ্যবসায়!

—০—

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট ওয়াসিংটন বক্তৃতা দিতে পারতেন না। আমেরিকা কি ভাবে পরিচালিত হবে সে সব নিয়ম ঠিক করিবার জন্য বৃহৎ সভা হয়। সেই সভায় দিনের পর দিন তিনি সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকিতেন কিন্তু মাত্র দুইদিন তিনি অল্প কয়েকটি কথা বলেন কিন্তু সেই কথাগুলিই অতি মূল্যবান ছিল ও সেই অনুসারে নতুন নিয়ম তৈরী হয়েছিল।

—০—

১৯০৮ সনে সাইবেরিয়ায় যে উল্‌কা পড়েছিল তার ওজন ছিল ৪০,০০০ টন। এত ভারী উল্‌কা এত জোরে পড়েছিল যে ৫০ মাইল অবধি লোকরা বুঝতে পেরেছিল। তখন গরম বাতাস বইছিলো, আর ২০ মাইলের মধ্যে গাছের গুঁড়ি উপড়িয়ে পড়ে গেল, আর হাজার হাজার জন্তু মরে গিয়েছিল।

—০—

বলত?

১। পৃথিবীতে সব চেয়ে পুরানো সহর কোন্‌টি এবং সেখানে এখনও লোক বাস করছেন?

২। লাল গোলাপ ফুলের মত রঙে রঙীন এর মধ্যে অতি পুরাতন কোন্ সহরটি বলতে পার কি?—

ডামাস্কাস, বাগদাদ, পেট্রা, এলেকজেন্দ্রিয়া, এলেপ্পো?

ধাঁধা

১। জাপান দ্বারা আক্রান্ত পাঁচটি দেশের নাম ওলোট পালট করে লেখা আছে—ঠিক নামগুলি বার করত?

—বোনই পান লয় মালির্ম্মা ফির্ণি বুণ্ডচী।

মুকুল প্রেস—২৯৪, দর্গা রোড, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কালা চাঁদ দের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা' গেঞ্জী

সকলের এত প্রিয় কেন?

একবার ব্যবহারে বুঝিতে পারিবেন।

সামার-লিলি
নটেড্ মেস
ফ্যান্সি-নীট
সুপার-ফাইন
কালার-সার্ট
লেডী-ভেষ্ট
কুল্‌টী

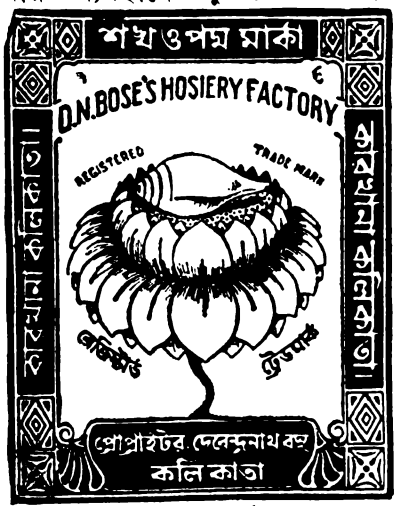

সামার-ব্রীজ
শো-ওয়েল
কুল-ওয়্যার
সামার-নীট
গ্রে-সার্ট
সিল্‌কট
স্যাণ্ডো

সুদীর্ঘকাল ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট—আপনিও সন্তুষ্ট হইবেন।

কারখানা—৩৬।১এ, সরকার লেন, কলিকাতা। ফোন—বড়বাজার [illegible]৫৬

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

প্রচুর ফেন :: স্নেহময় স্পর্শ
মনোরম গন্ধ

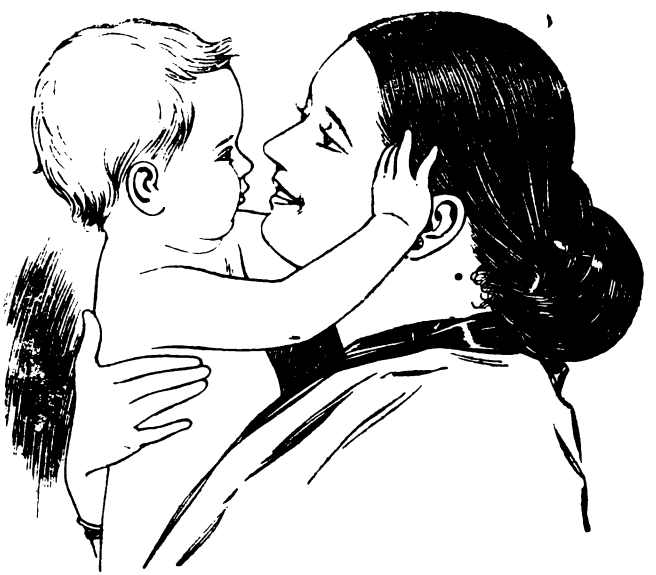

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা .. বোম্বাই